ফেব্রুয়ারি ২০২১ ▪ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

মাতৃভাষার কথা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কথা

বাংলাদেশে মাতৃভাষা: বর্তমান অবস্থা

ভাষা আন্দোলনের চেপে রাখা ইতিহাস (প্রথম পর্ব)

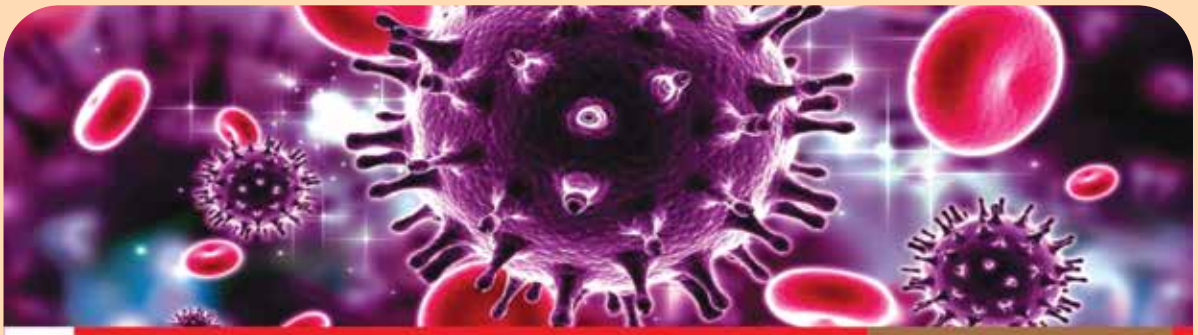

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ফেব্রুয়ারি ২০২১ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে জানুয়ারি ২০২১ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তরকালে মোনাজাতে অংশ নেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস– যা বাঙালির জীবনে ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল এবং অর্জনের গৌরবে চিরভাস্বর। মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের জন্য বুকের রক্ত দেওয়ার গৌরবান্বিত ইতিহাস রয়েছে আমাদের। ভাষা সংগ্রামের পথ ধরেই বিকশিত হয় বাঙালির স্বাধিকার চেতনা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের শোণিতধারায় বাঙালির অধিকার আদায়ের যে আলোকিত পথের উন্মোচন হয়েছিল, সেই পথ ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ভাষা আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা পালন করেন বঙ্গবন্ধু। আত্মমর্যাদায় সমুন্নত এক জাতি হিসেবে বাঙালির বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অন্তহীন অনুপ্রেরণা– অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। মাতৃভাষার প্রতি বাঙালির এই আত্মত্যাগের জন্য ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০০ সাল থেকে পালন করা হয়। এখন একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে হয়ে উঠেছে বিশ্বমানবের। দেশে দেশে মাতৃভাষাকে সমুন্নত রাখার শপথ নেওয়া হয় এ দিবসে। আমাদের একান্ত প্রত্যাশা– এর মাধ্যমে বাংলাসহ অন্যান্য ভাষাভাষী নতুন উদ্দীপনায় মাতৃভাষার মান-মর্যাদা সংরক্ষণে হবে ব্রতী এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বিলুপ্তপ্রায় মাতৃভাষা পুনরুজ্জীবিত হবে। মাতৃভাষা ব্যবহারে সচেতনতাই হোক মহান ভাষা শহিদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সকল ভাষা শহিদ, ভাষাসৈনিক ও ভাষা-সংগ্রামীর প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা। এ দিবস নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যা।

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই জানুয়ারি ২০২১ জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি এ সংখ্যায় সংযুক্ত করা হলো।

এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত প্রতিবেদন নিয়ে *সচিত্র বাংলাদেশ* ফেব্রুয়ারি ২০২১ সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে।

আশা করি, এ সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ হুমায়ুন কবীর

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

ভাষণ

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

মাতৃভাষার কথা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কথা ৯
প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

বাংলাদেশে মাতৃভাষা: বর্তমান অবস্থা ১১
প্রফেসর ড. সৌরভ সিকদার

ভাষা আন্দোলনের চেপে রাখা ইতিহাস (প্রথম পর্ব) ১৪
ড. মোহাম্মদ হাননান

ভাষাসম্পদ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ১৮
রফিকুর রশীদ

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ২১
ড. মো. আব্দুস সামাদ

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু ২৪
বীরেন মুখার্জী

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯ ২৬
সুস্মিতা চৌধুরী

ভাষা আন্দোলন ২৮
শাহনাজ পারভীন

রহনপুরের খুন্তে বক ২৯
প্রফেসর ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

জ্ঞানজ্যোতি ড. আনিসুজ্জামান স্যারের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি ৩০
রহিম আব্দুর রহিম

মেধা বিকাশে গ্রন্থাগার এবং প্রজন্ম ৩২
সুমী শারমীন

বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরি ৩৪
অনুপম হায়াৎ

প্রমিত বাংলা বানান ও উচ্চারণ ৩৬
সায়েরে নাজাবী সায়েম

সচেতনতায় শিশু ক্যানসার নিরাময় হয় ৩৮
সুরাইয়া সুলতানা

অনিন্দ্য সুন্দর সুন্দরবন ৩৯
সাইমন ইসলাম সাগর

গল্প

বাবা ও বাংলা ভাষার গল্প ৪০
জব্বার আল নাঈম

হাইলাইটস

কবিতাগুচ্ছ ৪৩-৪৬

আ. শ. ম. বাবর আলী, স. ম. শামসুল আলম মোহাম্মদ আজহারুল হক, জাহাঙ্গীর আলম জাহান অদ্বৈত মারুত, আবুল হোসেন আজাদ, লিলি হক মুহাম্মদ ইসমাঈল, বাবুল তালুকদার, রকিবুল ইসলাম, কামাল বারি, মোঃ আহছান উল্লাহ্ খোরশেদ আলম নয়ন, সুধীর কৈবর্ত, চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু, সাহিদা খাতুন, মনির জামান

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৭
প্রধানমন্ত্রী ৪৮
তথ্যমন্ত্রী ৪৯
জাতীয় ঘটনা ৫০
আন্তর্জাতিক ৫০
উন্নয়ন ৫১
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫২
শিল্প-বাণিজ্য ৫২
শিক্ষা ৫২
বিনিয়োগ ৫৩
নারী ৫৪
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৫
কৃষি ৫৫
বিদ্যুৎ ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৭
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
কর্মসংস্থান ৫৮
যোগাযোগ ৫৯
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৫৯
চলচ্চিত্র ৬০
সংস্কৃতি ৬০
মাদক প্রতিরোধ ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
প্রতিবন্ধী ৬৩
ক্রীড়া ৬৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন অভিনেতা আবদুল কাদের ৬৪

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের সমৃদ্ধশালী-মর্যাদাশীল দেশ। আমরা ২০২১ সালের পূর্বেই উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি। করোনাভাইরাসের মহামারি সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতি সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে আমাদের বহুল আরাধ্য নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতুর সর্বশেষ স্প্যান বসানোর মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে রাজধানীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্পগুলেরর কাজও পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪

মাতৃভাষার কথা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কথা

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা পৃথিবীতে অনন্য গৌরবের অধিকারী এজন্য যে, তা একটি রাষ্ট্রের জনয়িতা। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সরণি বেয়েই সূচিত হয়েছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পুঁজিবাদী শোষণ আর উন্নত প্রযুক্তির নামে ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়ন নীতির বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন তথা ২১শে ফেব্রুয়ারি কিংবা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পথনির্দেশক হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়ে 'মাতৃভাষার কথা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৯

বাংলাদেশে মাতৃভাষা: বর্তমান অবস্থা

বাংলা ছাড়া আরো ৪০টি ভাষা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে 'প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা'র কথা বলেছে। চাকমা, মারমা, ককবোরক, গারো (মান্দি) ও সাদরি ভাষীদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণির পুস্তক প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তা সরকারিভাবে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ক্রমে অন্যান্য ভাষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে। এ বিষয়ে 'বাংলাদেশে মাতৃভাষা: বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১১

ভাষা আন্দোলনের চেপে রাখা ইতিহাস (প্রথম পর্ব)

বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বামপন্থিদের ভূমিকা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনাকারদের অনেকেই এই ধারাকে অনুসরণ করেছেন। সে সময়ের তেজস্বী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা তাদের গ্রন্থে অজ্ঞাত ছিল, কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর অবদানকে খাটো করে দেখার প্রবণতাও ছিল। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী এ আন্দোলনের ভেতরের সকল ইতিহাসকেই নির্মোহভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। এ বিষয়ে 'ভাষা আন্দোলনের চেপে রাখা ইতিহাস (প্রথম পর্ব)' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১৪

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৭১৯৪৭২০, ই-মেইল: rupaprinting@gmail.com

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান মেয়াদের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি এবং তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই জানুয়ারি ২০২১ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন–পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

[৭ই জানুয়ারি ২০২১]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এবং বৈশ্বিক মহামারির অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। দুই বছর পূর্বে আজকের এই দিনে তৃতীয় মেয়াদে সরকার পরিচালনার যে গুরুদায়িত্ব আপনারা আমার উপর অর্পণ করেছিলেন, সেটিকে পবিত্র আমানত হিসেবে গ্রহণ করে আমরা সরকার পরিচালনার তৃতীয় বছর শুরু করতে যাচ্ছি।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদের সকলের সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করতে পারছি এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। এই শুভ মুহূর্তে আমি দেশ ও দেশের বাইরে অবস্থানরত বাংলাদেশের সকল নাগরিককে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং একই সঙ্গে খ্রিষ্টীয় ২০২১-এর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০-লাখ শহিদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিনভাই– মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ জামাল এবং ১০ বছরের শেখ রাসেল, কামাল ও জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, মুক্তিযোদ্ধা যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, মুক্তিযোদ্ধা কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ব্রিগেডিয়ার জামিল এবং পুলিশের এএসআই সিদ্দিকুর রহমানসহ সেই রাতের সকল শহিদকে।

এ উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

স্মরণ করছি ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহত আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভী রহমানসহ ২২ নেতা-কর্মীকে। স্মরণ করছি ২০০১ সালের পর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ.এম.এস কিবরিয়া, আওয়ামী লীগ নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টার, মঞ্জুরুল ইমাম, মমতাজ উদ্দিনসহ ২১ হাজার নেতাকর্মীকে।

২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামাত জোটের অগ্নি সন্ত্রাস এবং পেট্রোল বোমা হামলায় যাঁরা নিহত হয়েছেন আমি তাঁদের স্মরণ করছি। আহত ও স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর

রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রিয় দেশবাসী,

করোনাভাইরাসের মহামারির কারণে এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে আমাদের বিগত ২০২০ সাল অতিক্রম করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এবং উপর্যুপরি বন্যা আমাদের অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। আমরা সেসব ধকল দৃঢ়তার সঙ্গে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু করোনাভাইরাস-জনিত সংকট থেকে বিশ্ব এখনও মুক্ত হয়নি।

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে বাংলাদেশে এখনও সংক্রমণ ও মৃত্যুহার অনেক কম। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি এই মহামারি নিয়ন্ত্রণে রাখার। আশার কথা বিভিন্ন দেশে কোভিড-১৯-এর টিকা প্রদান শুরু হয়েছে। বাংলাদেশেও আমরা দ্রুত টিকা নিয়ে আসার সব ধরনের চেষ্টা করছি। টিকা আসার পর পরই চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সম্মুখসারির যোদ্ধাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে টিকা প্রদান করা হবে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী এবং মাঠ প্রশাসনের সদস্যসহ সম্মুখসারির করোনাযোদ্ধাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মহামারি সাহসের সাথে মোকাবিলা করার জন্য। করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পরপরই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগসহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ দরিদ্র-অসহায় মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাঁদের মৃত্যু হয়েছে আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি।

প্রিয় দেশবাসী,

করোনাভাইরাস মহামারি ইতোমধ্যেই বিশ্ব অর্থনীতিতে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। অনেক দেশের অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে এসেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিও ক্ষতির মুখে পড়েছে।

তবে, বিভিন্ন নীতি-সহায়তা এবং বিভিন্ন উদারনৈতিক আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানের মাধ্যমে আমরা অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখন পর্যন্ত আমরা ১ লাখ ২১ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি যা মোট জিডিপি'র ৪.৩ শতাংশ।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা সে প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রেখেছি। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় আড়াই কোটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আমরা নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সহায়তার আওতায় এনেছি। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গত অর্থবছরে আমাদের জিডিপি ৫.২৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের প্রাক্কলন অনুযায়ী এ বছর জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৭.৪ শতাংশে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রক্ষেপণ অনুযায়ী জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হারে বাংলাদেশের অবস্থান হবে এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। আইএমএফ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ সালের সবচেয়ে বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী শীর্ষ দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। ২০২০-এ মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলারে।

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের শুরুতে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম যে দেশবাসীর সহায়তায় আমরা এই দুর্যোগ মোকাবিলা সফলভাবে করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, দেশবাসী এ দুঃসময়ে আমার এবং আমার সরকারের পাশে ছিলেন এবং আপনারা আমাদের এই দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছেন। এ ধরনের যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে পাবো– এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ; একটি জাতিরাষ্ট্র। আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছি। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের যেখানে সকল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশার মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। প্রতিটি মানুষ অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ যখন পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখনই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। তাঁকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

তারপর অনেক চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র। সামরিক শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষণ, গণতন্ত্রহীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিচ্যুতি, ইতিহাস বিকৃতিসহ শাসকদের নানা অপকীর্তি প্রত্যক্ষ করেছে এ দেশের মানুষ আপনারা। জনগণের সম্পদ লুটপাট করে, তাঁদের বঞ্চিত রেখে, ৩০-লাখ শহিদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করে বাংলাদেশকে পরনির্ভরশীল করে রেখেছিল।

১৯৭৫ সালের বিয়োগান্তক ঘটনার পর আমরা দেশে আসতে পারিনি। ৬ বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে আমি ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আসি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেকে সমর্পণ করি। আমার একটাই লক্ষ্য ছিল জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানো।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। মাঝখানে ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বিএনপি-জামাত এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সে প্রচেষ্টায় ছেদ পড়েছিল।

কিন্তু ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১২ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর্থসামাজিক এবং অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। *দ্য ইকোনমিস্ট*-এর ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬৬টি উদীয়মান সবল অর্থনীতির দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯ম। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

প্রিয় দেশবাসী,

২০১৮ সালে একাদশ সংসদ নির্বাচনে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক ইশতেহার ঘোষণা করেছিলাম। আমাদের নির্বাচনি ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নির্মূল করে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণ করা।

২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের সমৃদ্ধশালী-মর্যাদাশীল দেশ। আমরা ২০২১ সালের পূর্বেই উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি। প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমরা পথ-নকশা তৈরি করেছি। রূপকল্প ২০৪১-এর কৌশলগত দলিল হিসেবে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে ২০২০-২০২৫ মেয়াদি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে যা বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা। এ মেয়াদে ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে নেমে আসবে। শেষ বছর ২০২৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৮.৫১ শতাংশে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এর আগে আমরা 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' শীর্ষক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। করোনাভাইরাসের মহামারি সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতি সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে আমাদের বহুল আরাধ্য নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন পদ্মাসেতুর সর্বশেষ স্প্যান বসানোর মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে রাজধানীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পদ্মাসেতুর ৮২ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী বছর এই স্বপ্নের সেতু যানবাহন এবং রেল চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে।

অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্পগুলির কাজও পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রোরেলের ১৪ কিলোমিটার অংশের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ইতিহাসে এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিটের নির্মাণ কাজের ৮০ শতাংশ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।

নির্ধারিত সময় ২০২৩ সালের এপ্রিল নাগাদ এই ইউনিট থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে।

চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের কাজও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এই টানেলের ৬২ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

জনগণের সরকার হিসেবে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলেই মনে করি। গত একযুগে আমরা জনগণের জন্য কী করেছি, তা মূল্যায়নের ভার আপনাদের। আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে– সেরকম কয়েকটি খাতের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

২০০৯ সালে আমাদের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির কথা একবার স্মরণ করুন। কী দুঃসহ পরিস্থিতি ছিল সে সময়। বিদ্যুৎ কখন আসবে আর কখন যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আমরা অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে আজ বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছি।

২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ৪২১ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ২০০৫-০৬ সালের ৪৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পায়রাতে ইতোমধ্যে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

রামপাল, পায়রা, বাঁশখালী, মহেশখালী এবং মাতারবাড়িতে আরও মোট ৭ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলছে। মুজিব বর্ষে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। সব ঘর আলোকিত হবে।

২০০৯ সালে জাতীয় গ্রিডে ১ হাজার ৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হতো বর্তমানে যা ২ হাজার ৫২৫ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। গ্যাসের অব্যাহত চাহিদা মেটাতে ২০১৮ থেকে তরলীকৃত গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী,

আজ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে ৪র্থ থেকে ৩য় স্থানে উন্নীত হয়েছে। অব্যাহত নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে এই বিপ্লব সাধিত হয়েছে। শুধু ২০১৯-২০ বছরে কৃষিখাতে ৭ হাজার ১৮৮ কোটিরও বেশি টাকা ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। মাছ-মাংস, ডিম, শাকসবজি উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের গ্রামগুলি বরাবরই উন্নয়ন ভাবনার বাইরে ছিল। আমরাই প্রথম গ্রামোন্নয়নকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করি। ২০১৮ সালে আমাদের নির্বাচনি ইশতেহারে বিষটি অন্তর্ভুক্ত করে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার করি।

আজ দেশের প্রায় সকল গ্রামে পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত পল্লি এলাকায় ৬৩ হাজার ৬৫৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, ৩ লাখ ৭৬ হাজার ব্রিজ-কার্লভার্ট, ১ হাজার ৬৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ৯৩৬টি

সাইক্লোন সেন্টার এবং ২৪৯টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

২০০৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৪৫৩ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক চার বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। আরও ৬৬১ কিলোমিটার মহাসড়ক চার বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। ঢাকায় বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ ২০২৩ সাল নাগাদ শেষ হবে।

২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৪৫১ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং ১ হাজার ১৮১ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৪২৮টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ করা হয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা যমুনা নদীর উপর ৪.৮ কিলোমিটির দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। লোকোমোটিভ যাত্রীবাহী ক্যারেজ এবং মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে ১ হাজার ৪০টি। এই সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১৩৭টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের বিমানবহরে ১২টি নতুন অত্যাধুনিক বোয়িং এবং ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ সংযোজিত হয়েছে। গত মাসে ১টি ড্যাশ-৮-৪০০ উড়োজাহাজ সংযোজিত হয়েছে। চলতি মাসে আরও ২টি ড্যাশ-৮-৪০০ উড়োজাহাজ সংযোজিত হবে।

সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সারা দেশে সাড়ে ১৮ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে গ্রামীণ নারী-শিশুসহ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়। আমাদের স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানোন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ২০১৯-২০ বছরে ৭২.৬ বছরে উন্নীত হয়েছে। ৫-বছর বয়সি শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৮ ও অনূর্ধ্ব ১ বছর বয়সি শিশু মৃত্যুর হার ১৫-তে হ্রাস পেয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার কমে দাঁড়িয়েছে লাখে ১৬৫ জনে।

প্রিয় দেশবাসী,

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখতে হচ্ছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, গোটা বিশ্বেই একই পরিস্থিতি। তবে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ নেই। অন-লাইনে এবং স্কুল পর্যায়ের জন্য টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খুলে দেওয়া হবে। বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই বিতরণ শুরু হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি টাকা শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৯৫৮ কোটি টাকার বৃত্তি-উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় স্নাতক ও সমমানের শ্রেণির আরও ২ লাখ ১০ হাজার ৪৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১১১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ১ হাজার টাকা করে কিট এলাউন্স দেওয়া হবে। এজন্য ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

দেশের ৭ হাজার ৬২৪টি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসায় ১ লাখ ৪৮ হাজার ৬১ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রতিমাসে ২৭৬ কোটি টাকা বেতন ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ২০২০ সালে নতুন করে ৪৯৯টি মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ১ হাজার ৫১৯টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৪ হাজার ৫২৯ জন শিক্ষককে ত্রৈমাসিক ৩ কোটি ১৫ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। দাওয়ারে হাদিস পর্যায়কে মাস্টার্স সমমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সারাদেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে।

করোনাভাইরাসের এই মহামারির সময়ে যখন মানুষের চলাচল সীমিত হয়ে পড়ে, তখন ডিজিটাল প্রযুক্তি যোগাযোগের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়।

আমাদের সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই এই ক্রান্তিকালে ডিজিটাল প্রযুক্তি ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেশের ১৮ হাজার ৩৩৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৩ হাজার ৮০০ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

করোনাভাইরাসের সময় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। অন-লাইনে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লেনদেন সুবিধা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১-এর মাধ্যমে দেশের সবগুলি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সম্প্রচার ছাড়াও প্রত্যন্ত ৩১টি দ্বীপে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কয়েকটি ব্যাংক এবং সেনাবাহিনী স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১-এর সেবা গ্রহণ করছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, চা শ্রমিক, বেদে সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীসহ দুরারোগ্য ব্যক্তিদের চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে সর্বমোট ৬ হাজার ৫২০ কোটি ৯০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৯০ লাখ ৫০ হাজার।

প্রিয় দেশবাসী,

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ আজ একটি সমীহের নাম। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব আজ চোখে পড়ার মত। 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়'– জাতির পিতা প্রণীত বৈদেশিক নীতির এই মূলমন্ত্রকে পাথেয় করে আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছি। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে এই মুহূর্তে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।

মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ দেশে ফেরৎ পাঠানোর সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কক্সবাজারে বিভিন্ন ক্যাম্পে তাঁদের কষ্ট লাঘবের জন্য ভাসানচরে ১ লাখ মানুষের বসবাসোপযোগী উন্নতমানের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে শুধু স্ব-ইচ্ছায় যেতে ইচ্ছুক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাঠানো হচ্ছে। আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের যে মহাসড়ক বেয়ে দুর্বার গতিতে ধাবিত হচ্ছে তা যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত হতে না পারে সেদিকে আপনাদের সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। উন্নয়নের পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আমরা বদ্ধপরিকর। কিছু অসাধু মানুষ নানা কৌশলে জনগণের সম্পদ কুক্ষিগত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছি। দুর্নীতিবাজ যে দলেরই হোক আর যত শক্তিশালীই হোক, তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং হবে না। এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে।

আইনের শাসন সমুন্নত রেখে মানুষের নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে যা যা প্রয়োজন আমরা তা করবো।

আমরা কঠোর হস্তে জঙ্গিবাদের উত্থানকে প্রতিহত করেছি। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ পারস্পরিক সহনশীলতা বজায় রেখে বসবাস করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু করোনাভাইরাসের মহামারি ছড়িয়ে পড়ার কারণে অনুষ্ঠানমালায় পরিবর্তন আনতে হয়েছে। গত বছরের ১৭ই মার্চ উদ্বোধন অনুষ্ঠান জনসমাগম ছাড়াই ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা 'বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন শীর্ষক' টিভি স্পট প্রচার করছি। অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকেট অবমুক্ত করা হয়েছে। স্বল্প দৈর্ঘ্য, এনিমেটেড চলচিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে। সারা দেশে ১ কোটি ১৫ লাখ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য প্রত্যেককে ২ শতাংশ খাসজমি বরাদ্দসহ ৬৫ হাজার ৭২৬টি ঘর তৈরির কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। একটি মানুষও ভূমিহীন থাকবে না, গৃহহীন থাকবে না, এই নীতি আমরা গ্রহণ করেছি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৪ হাজার গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

আগামী ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইউনেসকো সৃজনশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার চালু করেছে।

আগামী ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। করোনাভাইরাসের প্রকোপ না থাকলে আমরা সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করবো, ইনশাআল্লাহ। একইসঙ্গে চলতে থাকবে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা।

বাংলাদেশের মানুষের সৌভাগ্য এবং আওয়ামী লীগের জন্য গর্বের বিষয় যে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

১৯৯৭ সালে রজত জয়ন্তী উদযাপনকালেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ব্যতিত অন্য কোনো দল বা গোষ্ঠী স্বাধীনতার এই মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখার তাগিদ অনুভব করবে না।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন– আমি উদ্ধৃত করছি: 'স্বাধীনতা সংগ্রামের চাইতেও দেশ গড়া বেশ কঠিন। দেশ গড়ার সংগ্রামে আরও বেশি আত্মত্যাগ, আরও বেশি ধৈর্য্য, আরও বেশি পরিশ্রম দরকার। আমরা যদি একটু কষ্ট করি, একটু বেশি পরিশ্রম করি, সকলেই সৎপথে থেকে সাধ্যমত নিজের দায়িত্ব পালন করি, সবচাইতে বড় কথা, সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকি– তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি ইনশাআল্লাহ কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা আবার সোনার বাংলায় পরিণত হবে।' কোট শেষ।

আমরা আজ অনেকদূর এগিয়েছি সত্য। আমাদের আরও বহুদূর যেতে হবে। হতে পারে সে গন্তব্য পথ মসৃণ, হতে পারে বন্ধুর। বাঙালি বীরের জাতি। পথ যতই কঠিনই হোক, আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। আমরা যদি পরিশ্রম করি, সততা-দেশপ্রেম নিয়ে দায়িত্ব পালন করি, তাহলে আমরা সফলকাম হবোই, ইনশাআল্লাহ।

জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ভাষায় তাই বলতে চাই:

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে আসুন আমরা নতুন করে শপথ নেই– মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আদর্শকে ধারণ করে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক কল্যাণকামী সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

করোনাভাইরাসের এই অমানিশা দ্রুত কেটে যাক, মহান আল্লাহতায়ালার কাছে এই প্রার্থনা করি। ততদিন আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবনযাপন করুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আপনারা সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। আপনারা সুন্দর জীবনযাপন করেন সেই কামনা করি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মাতৃভাষার কথা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কথা

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

মাতৃভাষা বিশেষ কোনো ব্যক্তি-মানুষের যেমন অন্যতম পরিচয়-উৎস, তেমনি তা একটি জাতিসত্তার অস্তিত্বেরও শ্রেষ্ঠ স্মারক। মানুষের কাছে যেসব বিষয় তার প্রাণের মতোই প্রিয়, মাতৃভাষা তার অন্যতম। বস্তুত, মাতৃভাষাই একজন মানুষের পরিচয়ের শ্রেষ্ঠতম উৎস। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশেষ কোনো মানুষ নিজেকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরে, তুলে ধরে তার জাতিসত্তার পরিচয়। মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে কোনো জাতিই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না, পারে না নিজের পরিচয়কে পৃথিবীতে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করতে। যে জাতির মাতৃভাষা যত উন্নত, সে-জাতি সব দিক থেকেই তত উন্নত– এমন ধারণা সর্বজনস্বীকৃত।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আনুমানিক ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষা জন্ম লাভ করে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের অন্তর্গত বাংলা ভাষার জন্ম ইতিহাস বহু প্রাচীন। আজ আমরা যে ভাষায় কথা বলি, হাজার বছর পূর্বে আমাদের ভাষা এ রকম ছিল না। বস্তুজগতের সবকিছুর মতো ভাষাও নিয়মিত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে প্রতিষ্ঠা পায় ভাষার অভ্যন্তর শৃঙ্খলা, ভাষায় যুক্ত হয় নতুন নতুন শব্দরাজি, ভাষা হয়ে ওঠে সহজ ও প্রাত্যহিক জীবনানুগ। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কেও একথা সত্য। প্রাচীন বা মধ্যযুগে বাংলা ভাষার সঙ্গে আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার তুলনা করলেই এ বিষয়টি আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারব।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা পৃথিবীতে অনন্য গৌরবের অধিকারী এজন্য যে, তা একটি রাষ্ট্রের জনয়িতা। বাংলাদেশ ছাড়া এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই। আমাদের দেশই পৃথিবীর একমাত্র ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। এ সূত্রে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বীর সৈনিকদের। বস্তুত, তাঁদের অবদান ও আত্মত্যাগের ফলেই যেমন রক্ষা পেয়েছে বাংলা ভাষার মর্যাদা, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিসংগ্রামের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি। বস্তুত, ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সরণি বেয়েই সূচিত হয়েছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদ বরকত-রফিক-সালাম-জব্বারকে বাঙালি জাতি ও বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। তাঁদের সাহসী ভূমিকা ও গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগের ফলেই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, রক্ষা পায় বাংলা ভাষার অনন্য গৌরব। মানুষের ভাষা ব্যবহারের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবে বাংলা ভাষার অবস্থান সপ্তম। আমাদের মাতৃভাষার জন্য এ এক বিশাল গৌরব। পৃথিবীতে চার সহস্রাধিক ভাষার মধ্যে সপ্তম স্থানে থাকা বাংলা ভাষা প্রকৃত অর্থেই দাবি করতে পারে গৌরবের আসন। প্রায় ২৫ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। এ সংখ্যাতত্ত্বও আমাদের মাতৃভাষার গৌরবের অন্যতম ভিত্তি-উৎস।

বাংলা ভাষার অন্যতম গৌরব এই যে, এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে অনেক কবি-সাহিত্যিক পৃথিবীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। কাহ্নপা, বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জসীমউদ্‌দীন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শামসুর রাহমান প্রমুখ সাহিত্যিকের নাম আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা পৃথিবীতে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বাংলা ভাষার গৌরবের পতাকাকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। এইভাবে বহু মনীষীর মিলিত সাধনায় পৃথিবীর বুকে বাংলা ভাষা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় রচিত সাহিত্যসম্ভার বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। অনেক দীনতার মধ্যেও সাহিত্য সম্পদের জন্য বাঙালি জাতি প্রকৃত অর্থেই গৌরব বোধ করতে পারে। বাংলা ভাষায় রচিত আদিতম সাহিত্য-নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ। আনুমানিক হাজার বছর পূর্বে চর্যাপদগুলো রচিত হয়েছে। চর্যাপদের প্রধান কবিরা হচ্ছেন কাহ্নপা, লুইপা, শবরীপা, ভুসুকুপা প্রমুখ। চর্যাপদের পর বাংলা ভাষার অন্যতম সাহিত্যকীর্তি হচ্ছে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এরপর মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, রোমান্সমূলক প্রণয়কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি ধারা অতিক্রম করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি বিচিত্র শাখায় বিকশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই উপলব্ধি করা যায়, আমাদের মাতৃভাষা ভাব প্রকাশে কত শক্তিশালী! মানব অস্তিত্বের যে-কোনো ভাব প্রকাশেই আমাদের মাতৃভাষা সক্ষম। আধুনিক বাংলা কবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি শাখা পর্যালোচনা করলেই আমরা এ মন্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাব।

সংগীতের ক্ষেত্রেও আমরা মাতৃভাষা বাংলার অনন্য শক্তির পরিচয় পাই। বহু গীতি-কবি ও গীতিকার বাংলা ভাষায় সংগীত রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ গীতিকারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁদের সাংগীতিক কীর্তিও আমাদের মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাহান্নর শহিদদের স্বপ্ন এখন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রবণতার দিকে তাকালে মনে হয়, আমাদের মাতৃভাষা আবার অবহেলার শিকার। আমরা অন্য ভাষা অবশ্যই শিখব, পৃথিবীতে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য ইংরেজিসহ নানা ভাষায় শিক্ষালাভ জরুরি; কিন্তু মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে তা কখনোই সম্ভব নয়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, নিকট অতীত থেকে এই প্রবণতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

১৯৫২ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। এই দিনে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের ভাষা আন্দোলনকে পৃথিবীর মানুষের গৌরবিত উত্তরাধিকারে রূপান্তরিত করেছে। ১লা মে যেমন আন্তর্জাতিক মে দিবস, যা পালিত হয় পৃথিবীর সব দেশে, ২০০০ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি তেমনি পালিত হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর বাঙালি জাতির জীবনে এমন গৌরবোজ্জ্বল অর্জন আর ঘটেনি। ভাষা আন্দোলনের শহিদ রফিক-সালাম-বরকতরা এখন বিশ্ব মানুষের গৌরবিত অহংকার। পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা নিয়ে তৈরি হবে নতুন সচেতনতা। পৃথিবীর মানুষের সামনে আকাশ ছোঁয়া উচ্চতায় উঠে যাবে রফিক-সালাম-বরকতরা– একুশের ভোরে বিশ্বজুড়ে ঐকতান উঠবে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি!'

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেবল বাংলা ভাষাই নয়, গোটা বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল সব ইতিহাসই এখন উঠে আসবে বিশ্ব-মানুষের সামনে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা আমাদের জাতিগত পরিচয় এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসকে আরও গৌরবোজ্জ্বল ও মহীয়ান করেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার ফলে পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের সুযোগ পেল। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সাহসী ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের মনে হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মাধ্যমে পৃথিবীর সব ভাষা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। বস্তুত, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে শুধু বাংলা ভাষাই নয়, পৃথিবীর সব ভাষাকেই সম্মান করা হলো, স্বীকৃতি দেওয়া হলো। অতএব, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংগ্রাম আর আন্দোলনের অন্যতম শক্তি-উৎস হিসেবেই এখন দেখা দেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি, প্রতিবছরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে। এভাবে মাতৃভাষা হয়ে উঠবে বিশ্ব-মানুষের সংগ্রামের নতুন অস্ত্র।

পুঁজিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে মাতৃভাষা আর নিজস্ব সংস্কৃতির শক্তি জরুরি প্রয়োজন। মাতৃভাষা আর সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই কেবল ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা হয়ে উঠবে বিশেষ কোনো জাতিসত্তার নিজস্ব অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনসত্তা রক্ষারও সংগ্রাম। ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে এভাবে হয়ত পৃথিবীর মানুষ মুক্তির দিগন্ত দেখতে পাবে। তা না হলে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন ইন্টারনেটের ওয়েবসাবইটের একটি বিশেষ ভাষার দাপটে পৃথিবীতে দেখা দিবে নতুন ভাষা-উপনিবেশ। সেদিক বিবেচনা করলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পৃথিবীর মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে সংগ্রামের এক বিশ্ব হাতিয়ার।

এসব ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি একটা সন্দেহও যে মনের কোণে উঁকি দেয় না, তা নয়। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা রক্ষার সংগ্রাম যদি সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলে কোনো স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়, তাহলে লাভবান হবে সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই। কেননা, তাহলেই বিক্রি করা যাবে অস্ত্র, এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দুই পক্ষকেই করা যাবে পদানত। বর্তমান এক পরাশক্তির বিশ্বে এ ঘটনার যে আশঙ্কা নেই, তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়? অতএব, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রামের সময় এদিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি।

যে বাংলা ভাষার গৌরবের কথা উপরে আমরা বললাম, তার প্রকৃত অবস্থা কী? যদি আমাদের ভাষা-আন্দোলন ও মাতৃভাষার বর্তমান অবস্থা জানার জন্য পৃথিবীর কোনো দেশ থেকে কোনো প্রতিনিধিদল জরিপ করতে আসে, তাহলে কী দেখতে পাবে তারা? ভয়ংকর সে-দৃশ্য কল্পনা করা যায় কি? বস্তুত, বাংলাদেশে বাংলা ভাষার অবস্থা বর্তমানে রীতিমতো করুণ, নিজ বাসভূমে সে এখন পরবাসী, তার অঙ্গে এখন বহুবিধ লজ্জার স্পর্শ। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি একথা বলার চেষ্টা করেছে যে বাংলা সাহিত্যের ভাষা কিন্তু কাজের ভাষা নয়, উচ্চ শিক্ষার বাহন নয়– সে কথাই আজ স্বাধীন দেশে উচ্চারিত হচ্ছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে? ফেব্রুয়ারি এলে বাংলা ভাষার জন্য করুণ কান্না অঝোরে ঝরতে থাকে, ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে তা আবার শুকোতে শুরু করে, শুকোতে শুকোতে আবার কান্না আসে পরের বছরের ফেব্রুয়ারির পুণ্যতিথিতে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করায় এ অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন ঘটছে? বাংলা ভাষা কি হয়ে উঠতে পারছে আমাদের যথার্থ মাতৃভাষা? এসব প্রশ্নের জরুরি মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। কেবল বৃথা গৌরব বোধে স্ফীত হয়ে কোনো লাভ হবে না, প্রয়োজন মাতৃভাষার যথাযথ গৌরব বৃদ্ধিতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ।

পুঁজিবাদী শোষণ আর উন্নত প্রযুক্তির নামে ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়ন নীতির বিরুদ্ধে এভাবে ভাষা আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারি কিংবা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের সামনে নতুন পথনির্দেশক হয়ে উঠতে পারে। দেশে দেশে বঞ্চিত মানুষ তাদের সার্বিক মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে কাজে লাগাতে পারবে কিনা, তারই উপর নির্ভর করছে এই দিবসের মৌল তাৎপর্য।

লেখক: উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ

বাংলাদেশে মাতৃভাষা: বর্তমান অবস্থা

প্রফেসর ড. সৌরভ সিকদার

জন্মগ্রহণের পর মানবশিশু প্রথম যে ভাষা তার মা বা পরিবারের কাছে শেখে, সেটিই তার মাতৃভাষা। মূলত, যে প্রথম ভাষা শিশু আয়ত্ত করে সেটি হচ্ছে অর্জন এবং ক্ষেত্রে বিশেষে শিশুর মাতৃভাষা তার প্রথম ভাষা নাও হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মাতৃভাষায় তথা প্রথম ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য শিশুকে প্রয়োজনীয় প্রেরণা ও সহযোগিতা দেয় তার পরিবার ও চারপাশের প্রতিবেশ। ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে, প্রথম ভাষা এবং মাতৃভাষার অর্জনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই নিবন্ধে বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রথম ভাষা এবং মাতৃভাষাকে সমার্থক শব্দ হিসেবে বিবেচনা এবং উল্লেখ করব। শৈশবের শুরু থেকেই শিশুরা তাদের অনুভূতি ও মনোজগতের প্রকাশ ঘটাতে শুরু করে তার মাতৃভাষার মাধ্যমে। মাতৃভাষা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিশু ধারণ করে তার বংশানুক্রমিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবনযাপনের সংস্কৃতি প্রভৃতি (Clark 2003)। কিন্তু, একবিংশ শতাব্দীর যে যান্ত্রিক বাস্তবতা, সেখানে সব মানবভাষাই যে বিকশিত হওয়ার জন্য সমান সুযোগ পায়, বিষয়টি এমন নয়। যেসব ভাষা জ্ঞান-প্রযুক্তি-বাণিজ্যের শক্তিশালী বাহন, সেগুলো ছাড়া অন্য ভাষাগুলো কখনো কখনো নির্দিষ্ট ভাষিক প্রতিবেশে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে সেই ভাষাগুলোর বিকাশের সুযোগ। বাংলাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর অর্থাৎ বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। 'রাষ্ট্রভাষা' পরিভাষাটিতে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে বাঙালির ত্যাগ ও দৃঢ়তার পরিচয় বিধৃত। বাংলা শুধু 'রাষ্ট্রভাষা'ই নয় এ রাষ্ট্রের দাপ্তরিক এবং জাতীয় ভাষা।

বাংলাদেশে বাংলা ছাড়া আরো ৪০টি ভাষা রয়েছে– যেগুলো বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের মাতৃভাষা এমনটিই উঠে এসেছে বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ২০১৮)। এসব ভাষার কোনো কোনোটির ভাষী সংখ্যা অনেক, তবে বেশিরভাগ ভাষার ভাষী সংখ্যা কম। কিছু ভাষার ভাষী সংখ্যা এত কম যে এগুলো এখন বিপন্ন ভাষা। এসব ভাষা বিকশিত হওয়ার সুযোগ খুবই সংকীর্ণ। কারণ, তাদের প্রতিদিনের জীবনে এসব ভাষা ব্যবহারের সুযোগ কম। আবার, পরিকল্পিত লিপি এবং সাহিত্যচর্চার সঙ্গে ভাষার প্রাণস্পন্দনের সম্পর্ক আছে। সেদিক থেকে বিবেচনায়ও অনেক ভাষাই যথেষ্ট অগ্রসর নয়। বাংলাসহ বাংলাদেশের মাতৃভাষাগুলোর বর্তমান অবস্থা এখানে আলোচনা করা হলো।

শিক্ষায় বাংলা ভাষাচর্চার বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ভাষী সংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম ভাষা বাংলা (এথনোলগ, ২০২০)। বাংলা ভাষার সঙ্গে ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস জড়িয়ে আছে। মাতৃভাষার অধিকার ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাঙালিদের পাকিস্তান আমলে আন্দোলন করতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে বাঙালিদের ভাষিক স্বজাত্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজ একবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার প্রাণস্পন্দন সর্বদিকে ধ্বনিত হচ্ছে। পররাষ্ট্র বাদ দিয়ে দেশের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ বাংলা ভাষায়ই পরিচালিত হয়। তবে, হতাশার বিষয় এই যে, বাংলাদেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার সীমাবদ্ধ, কোনো কোনো জায়গায় বাংলা ভাষার প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। বিশেষ করে আদালত এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আবহ ইংরেজি ভাষাবান্ধব, সেখানে বাংলা ভাষার ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই নিরুৎসাহিত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক মূল ধারার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় বাংলায়। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় লেখাপড়া করে। তবে একইসঙ্গে দেখা যায়, ইংরেজি মাধ্যম এবং আরবি ভাষার সংশ্লিষ্টতায় মাদ্রাসা শিক্ষামাধ্যমের প্রচলন থাকায়, শিক্ষাক্ষেত্রে আরেকটি বহুভাষিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উভয়ক্ষেত্রেই বাংলা, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে দ্বৈতয়িক অবস্থানে থাকে। এছাড়াও উচ্চশিক্ষায় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোনো কোনো শাস্ত্রে বাংলা ভাষায় পড়াশোনার নমুনা পাওয়া যায় না। বিশেষত, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য অনুষদের বিষয়গুলোতে বাংলার ব্যবহার অত্যন্ত অবহেলিত। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলোতে বাংলা ভাষার বদলে ইংরেজি ভাষায়ই পড়াশোনা হয়। যদিও সেজন্য বাংলায় পাঠ্যপুস্তকের অভাবকে দায়ী করা হয়। যুবসমাজ চাকরির বাজারে দেখতে পায় যে বাংলা ভাষার চেয়ে ইংরেজি ভাষা দক্ষতার মূল্যমান বেশি। এটি কাম্য নয়। উল্লেখ্য, পৃথিবীর বহু খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাচর্চার জন্য বিভাগ, ইনস্টিটিউট রয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা শেখার জন্য কোর্স চালু করেছে। যদি শিক্ষার সার্বিক অবস্থানে বাংলা কতটুকু সংহত এই প্রশ্ন ওঠে, তবে এর সরল উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ সংখ্যার হিসেবে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বাংলায় শিক্ষাগ্রহণ করলেও উচ্চশিক্ষা এবং অন্যান্য শিক্ষামাধ্যমে বাংলার অবস্থান এখনো যে স্বীয় মর্যাদায় মহিমান্বিত, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষাসমূহ

বাংলাদেশে বাংলা ছাড়া যে ৪০টি ভাষা রয়েছে, সেগুলো মূলত চারটি বড়ো ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এ ভাষাপরিবারগুলো হলো: অস্ট্রো-এশিয়াটিক, চীনা-তিব্বতি, দ্রাবিড় এবং ইন্দো-ইউরোপীয় (সিকদার ২০১১)। এসব ভাষার ভাষীদের একটা বড়ো অংশ পার্বত্য অঞ্চলে এবং অন্যান্যরা সমতল ভূমিতে বাস করে। এগুলোর মাঝে কিছু ভাষার ভাষী সংখ্যা বাংলাদেশে কম হলেও ভারতে প্রচুর। বাংলাদেশের মূলধারার অর্থনীতি পরিচালিত হয় বাংলা ভাষায়। জাতীয় জীবনের সব কার্যক্রম বাংলায় পরিচালিত হওয়ায় সেগুলোতে যুক্ত হওয়া তাদের জন্য কঠিন। দেখা যায়, এসব ভাষার ভাষীরা বেশির ভাগের বাস প্রত্যন্ত অঞ্চলে; বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন জেলার দুর্গম পাহাড়ে এবং উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রান্তিক সীমানায়।

ভাষী সংখ্যার বিচারে এসব ভাষার মাঝে চাকমা, মারমা, ককবোরক, সাঁওতালি, মান্দি ও সাদরি ভাষার ব্যবহার পরিসর বেশ বড়ো এবং চর্চা হবার সুযোগ বেশি বলা যায়। তঞ্চঙ্গা, রাখাইন, মুণ্ডা, খাসিয়া, ম্রো, মণিপুরি মৈতেয় এবং মণিপুরি

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা ঐতিহ্যের দিক দিয়ে বেশ সমৃদ্ধ। এসব ভাষা কী অবস্থায় আছে জানতে হলে, ভাষীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। এই ভাষার ভাষীরা যারা যথেষ্ট বয়স্ক, তাদের বেশিরভাগের জীবন নিজ সম্প্রদায়ের পরিধিতে সীমাবদ্ধ। সুতরাং, তাদের মাঝে ভাষাগুলো শক্তভাবেই বেঁচে আছে। যারা মধ্যবয়স্ক, তাদেরও বেশিরভাগ জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন নিজেদের পরিধিতেই। তাদের কেউ কেউ মূলধারার অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। এরা বাংলা শিখে নিয়েছেন এবং সাধারণত কেবল ঘরে বা নিজ সম্প্রদায়ে মাতৃভাষা ব্যবহার করে থাকেন। বয়সে তরুণ এবং শিশুদের কথা বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় পরিচালিত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ লেখাপড়া করছে। এ প্রজন্মের মাঝে তাদের মাতৃভাষার ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। এরা নিজেদের মাতৃভাষা থেকে সরে গেছে প্রধানত দুভাবে– নিজস্ব মাতৃভাষা আয়ত্তের পর স্কুল কলেজে দীর্ঘ সময় বাংলা ভাষায় লেখাপড়া এবং কথা বলার জন্য এরা বাংলাই ব্যবহার করছে, আর অন্যদের অভিভাবকেরা সন্তানকে ভবিষ্যৎ সুবিধার জন্য নিজেদের ভাষা শেখাননি। দেখা যাচ্ছে, একটি ভাষার পূর্ণ প্রাণস্পন্দনের জন্য বংশানুক্রমিক যে সঞ্চারণ প্রয়োজন, এ ভাষাগুলোতে তার গতি ক্রমশ ধীর হয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্ম যদি পিতামাতার ভাষার বদলে অন্য কোনো ভাষা আয়ত্ত করতে থাকে, তবে ভাষাটির ভাষী সংখ্যা দ্রুতই কমতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এসব ভাষার অবস্থা ক্রমশ সংকটাপন্ন হচ্ছে, তা স্পষ্টতই দেখা এবং বলা যায়।

বাংলাদেশের যেসব ভাষা বিপন্ন

একটি ভাষাকে তখনই বিপন্ন বলে মনে করা হয় যদি সেই ভাষার ভাষী সংখ্যা অতিস্বল্প হয় এবং ভাষী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কোনো সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে দেখা না যায়। বরং, বর্তমান ভাষী যারা আছেন, তাদের মৃত্যু বা অন্যান্য কারণে বিপন্ন ভাষাগুলো নিয়মিতই ভাষী হারায় এবং নতুন প্রজন্মের কাছে অবহেলিত হয়ে পড়ে। ফলে, বিপন্ন ভাষাটি মৃতভাষায় পরিণত হয়ে পড়ে, যদি সেটির পুনর্জাগরণের উদ্যোগ নেওয়া না হয়। ভাষার বিপন্নতা পরিমাপের জন্য নির্ধারিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে বাংলাদেশের নিম্নোল্লেখিত ভাষাগুলো বিপন্ন ভাষার তালিকায় রয়েছে: খাড়িয়া, সৌরা, কোল, কোডা, মালতো, কন্দ, খুমি, পাংখোয়া, রেংমিটচা, চাক, খিয়াং, পাত্র, লুসাই, মুণ্ডা। এর মাঝে কিছু ভাষার ভাষী সংখ্যা এক হাজারেরও নিচে। রেংমিটচা ভাষার ভাষী সংখ্যা পঞ্চাশের নিচে। এছাড়াও কিছু ভাষা রয়েছে, যেগুলো এখনো বিপন্ন নয়, তবে বিপন্ন হওয়ার পথে রয়েছে। বিপন্ন এসব ভাষার জন্য প্রয়োজন মাঠপর্যায়ের ভাষা-গবেষণাভিত্তিক ভাষা সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব ভাষার প্রচার এবং প্রসার ঘটানো। বিশ্বের অনেক দেশেই সরকারি উদ্যোগে এসব ভাষাগুলোর প্রতি মানবিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ভাষাগুলোকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে, আমাদের দেশে এমন উদ্যোগের উপযোগিতাও অবশ্যই সময়োপযোগী।

মাতৃভাষা ও বহুভাষিক পরিস্থিতি

বাংলা বাদে অন্য যে ৪০টি ভাষা বাংলাদেশে রয়েছে, সেসব ভাষার শিশুদের একেবারে শুরু থেকেই বহুভাষিকতার জটিলতার সামনে পড়তে হয় (বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফীয় গবেষণা ২০১৫)। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আদিবাসী শিশু দ্বিভাষিক, অনেক ক্ষেত্রেই বহুভাষিক। আদিবাসী শিশুদের নিজ ভাষার পাশাপাশি বাংলা আয়ত্ত করতে হয়– সে অর্থে তারা অতি অল্প বয়স থেকেই দ্বিভাষিক। স্কুলে এসে যখন ইংরেজি শিখতে হয়, তখন তারা বহুভাষিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে বহুভাষিকতার চর্চা করতে হলে শিশুর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে। যেসব ভাষায় ভাষীর সংখ্যা খুব বেশি না, তাদেরকে নিজস্ব ভাষা এবং বাংলা বাদে অন্য একটি আদিবাসী ভাষাও শিখতে হয় আঞ্চলিক অন্যান্য বড়ো আদিবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে। যেমন, কুঁড়ুখ ভাষার একটি শিশুকে সাদরি শিখতে হয় আবশ্যিকভাবেই, কারণ সাদরি উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর জন্য 'লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা'র মতো (সিকদার ২০১১)। এরপর, স্কুলে তাকে বাংলা এবং ইংরেজি শিখতে হয়; শুধু পরীক্ষা পাসের জন্য নয়। বাংলা ও ইংরেজিতে পূর্ণ যোগাযোগের জন্যই তাকে এ ভাষাগুলো আয়ত্ত করতে হয়। এমনকি ভবিষ্যতে চাকরি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য দরকার। বহুভাষিকতার এ জটিলতা থেকে মুক্তির জন্য অনেক বাবা-মা তাদের শিশুদের নিজেদের ভাষাটি লিখতে-পড়তে শেখান না। কখনো কখনো ঘরে সেই পিতামাতাও নিজেদের ভাষা বর্জন করে কথা বলতে শুরু করেন। এভাবে, বাংলাদেশের অন্য ভাষার ভাষীদের মাতৃভাষার ব্যবহার ক্রমাগত কমে যাচ্ছে।

লিপি ও পাঠ্যপুস্তক

কোনো ভাষা লেখার জন্য নির্ধারিত লিপি ও বানানপদ্ধতি আছে কি নেই, তার উপর একটি ভাষার বিকাশের বিষয়টি নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বাংলা, চাকমা, মারমা, রাখাইন, তঞ্চঙ্গা, মণিপুরি মৈতেয়, চাক এবং ম্রো ভাষার নিজস্ব লিপি অর্থাৎ বর্ণমালা ও বানানপদ্ধতি রয়েছে (সিকদার ২০১১)। সুতরাং, এসব ভাষার বেশিরভাগেরই সাহিত্যিক ঐতিহ্যও বেশ সমৃদ্ধ। সাঁওতালি ভাষা লেখার জন্য বাংলা ও রোমান উভয় লিপি ব্যবহৃত হয়। সাদরি ভাষা ও মণিপুরি বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা লেখা হয় বাংলা লিপি ব্যবহার করে। মান্দি, খাসিয়া, ককবোরক ভাষা লিখিত হয় রোমান লিপিতে। তবে ইন্টারনেটে আদিবাসীরা প্রধানত রোমান লিপিই ব্যবহার করেন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলা লিপি। বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে 'প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা'র কথা বলেছে। এই মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম (Mother tongue-based Multilingual Education MTB-MLE)। এজন্য নিজ নিজ বর্ণমালা ও বানানপদ্ধতি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। চাকমা, মারমা, ককবোরক, গারো (মান্দি) ও সাদরি ভাষীদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণির পুস্তক প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে (সিকদার ২০১৪)। সাঁওতালি ভাষায় পুস্তক প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও লিপিসংক্রান্ত জটিলতায় তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। ক্রমে অন্যান্য ভাষায়ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে। পাঠ্যপুস্তক তৈরি হলেও আদিবাসী ভাষায় প্রয়োজনীয় শিক্ষা কার্যক্রম পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। কারণ, যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং শিক্ষায়তনের অভাব। আদিবাসী ভাষা ও বর্ণমালা বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন যথেষ্ট শিক্ষক নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকে হয়তো বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য মাতৃভাষায় দক্ষতার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব রয়েছে। সুতরাং, বই তৈরি হলেও পড়াবার জন্য যথেষ্ট মানবসম্পদ নেই। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ও তৈরি জরুরি।

কারণ, তাদের জাতিসত্তাগত ও পাঠ্যক্রমে অনুসৃত সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। তাই, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে বিদ্যালয় ও যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক প্রয়োজন।

গণমাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষাসমূহ

গণমাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষাগুলো বাবহারের সুযোগ একেবারেই সীমিত। সিলেটের আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭৮ সাল থেকে মণিপুরিদের ভাষা ও ঐতিহ্য বিষয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে আসছে (সিকদার ২০১৪)। এখানে এক সপ্তাহে মণিপুরি ও অন্য সপ্তাহে বিষ্ণুপ্রিয়াদের নিয়ে এ আয়োজন করা হয়। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান কেন্দ্র থেকে চাকমা, তঞ্চঙ্গা, মারমা, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য জাতির ওপর অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। রাজশাহী বেতার থেকেও সাঁওতালি ভাষার অনুষ্ঠান হয়। বছরজুড়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চ্যানেলে অল্প পরিমাণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বিভিন্ন উৎসব নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। যেমন, চাকমা গান ও নাচ, মণিপুরি ও গারো নাটক, মারমা ও রাখাইনদের উৎসব, ত্রিপুরা নৃত্য প্রভৃতি টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশন বেশ একটু এগিয়ে আছে। কিন্তু, সব মিলিয়ে এমন প্রচারের সংখ্যা নগণ্য। প্রতিবছর ৯ই আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে ঢাকায় শহিদমিনার এবং শিল্পকলা কিংবা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে দিনব্যাপী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির উপস্থাপন হয় (সিকদার ২০১৪)। সংবাদপত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট প্রতিবেদন ছাপা হয়, তবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষায় প্রচারিত কোনো দৈনিক পত্রিকা নেই। শুধু বিশেষ দিবসে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষায় কিছু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। একটি ভাষার প্রাণপ্রাচুর্যের জন্য গণমাধ্যমে যে পরিসর প্রয়োজন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষাগুলোর জন্য তা তৈরি হয়নি।

তথ্যপ্রযুক্তি এবং আন্তর্জাল (ইন্টারনেট) পর্যায়ে মাতৃভাষা চর্চার অবস্থা

একুশ শতকের জীবনযাপনে আন্তর্জাল তথা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন আঙ্গিনায় আমাদের স্বীয় বিচরণ কিন্তু ভাষার মাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের পারস্পরিক যোগাযোগ থেকে প্রকাশের প্রবণতার সবখানেই মাতৃভাষায় প্রকাশের প্রবণতা আগের চেয়ে বহুলাংশে বেড়েছে– এটি খোলাচোখে ইতিবাচক একটি বিষয়। কম্পিউটারের পর্দা থেকে শুরু করে স্মার্টফোনে সবখানেই ইউনিকোডে বাংলা লেখার হার আগের চেয়ে বেশি এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যায় বেশ বর্ধিষ্ণু একইসঙ্গে, কথ্য বাংলাকে লেখার পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রবণতা এমন বাংলা লেখায় চলে আসছে যেটি বেশ উদ্বেগের বিষয়। ভাষিক ব্যাকরণ থেকে বিচ্যুতিও এই আন্তর্জালিক বাংলার ব্যবহারে শঙ্কা নিয়ে আসে। বাংলার এবং ব্যাকরণিক শুদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভবপর। এছাড়াও বাংলা ভাষাকে তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য ভাষা প্রযুক্তির বিভিন্ন অনুষঙ্গ যেমন যান্ত্রিক ভাষা অনুবাদ, ভাষা কর্পাস, শব্দজাল, টেক্সট টু স্পিচ, স্পিচ টু টেক্সট ইত্যাদির জন্য ভাষা উপযোগী করা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা উদ্যোগ। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলা তথ্যপ্রযুক্তি উপযোগী একটি সমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হবে। বাংলা ছাড়া অন্যান্য যেসব ভাষী রয়েছে, তারাও রোমান হরফে এবং বাংলা হরফে নিজেদের ভাষাকে লেখ্যরূপে আন্তর্জালে তুলে ধরছেন। বিশ্বের অনেক স্থানেই নিজ নিজ ভাষায় আদিবাসী জনগণের মাতৃভাষা চর্চার প্রবণতা বাড়লেও, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং নিজস্ব পরিচয়কে আরো বৈশ্বিকভাবে উপস্থাপনের যে চেষ্টা তার স্বীকৃতি এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়া সেভাবে শুরু হয়নি (Carlson & Dreher 2018)। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষিত তরুণগোষ্ঠী তাদের ভাষায় যেসব উচ্চারণের জন্য বিশেষ চিহ্ন প্রয়োজন হয়, সেগুলোকেও বিভিন্ন যতিচিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা করছেন, এভাবে ভাষাচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত রাখছেন। তাই লিপিহীন ভাষাগুলোর লেখ্যরূপের মানকরণের একটি প্রচেষ্টা এখন জরুরি একটি বিষয়।

বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা বাংলা। অন্য ভাষাগুলোর কিছু রয়েছে ভালো অবস্থায়, কিছু বিপন্ন এবং কিছু ভাষা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আদিবাসী ভাষাগুলোর অর্থনৈতিক উপযোগিতা বিধান করা না গেলে এ ভাষাগুলোর ভাষী-সংকোচন থামানো যাবে না। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষা ডকুমেন্টেশন, লিপি প্রণয়ন, অভিধান তৈরি ও ব্যাকরণ রচনার জন্য উদ্যোগ প্রয়োজন। এসব উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ভাষাকে টিকিয়ে রাখার সমসাময়িক জরুরি পদক্ষেপ হচ্ছে ভাষা প্রামাণ্যকরণ এবং নথিকরণ (ডকুমেন্টেশন)। তবে, শুধু শুধুই তাত্ত্বিক গবেষণায় ভাষা বাঁচে না– ভাষার বিকাশের জন্য প্রয়োজন বড়ো পরিসরের ব্যবহার ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং ভাষীসংখ্যা হ্রাসের গতি উলটোমুখী করা। সংবিধানের ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিটি জাতিসত্তার বিকাশের জন্য সমান সুযোগ প্রাপ্তির যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি যদি বাস্তবায়ন করতে হয়, সব অংশীজনের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়া জরুরি। বৈচিত্র্যের সহাবস্থান জাতীয় উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাতৃভাষাগুলো যাতে টিকে থাকে, ভালো থাকে, একুশ শতকের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য আজ তা গুরুত্বপূর্ণ দাবি। একইসঙ্গে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে শুধু বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই নয় বরং বৈশ্বিকভাবে প্রযুক্তিবান্ধব একটি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠাকল্পে কাজ করা ও সময়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

গ্রন্থনির্দেশ

বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা, ২০১৮ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট , ঢাকা

বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফীয় গবেষণা (২০১৫), উৎস প্রকাশন, ঢাকা

সিকদার, সৌরভ (২০১১), *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সিকদার, সৌরভ, (২০১৪) *বাংলাদেশের আদিবাসী: ভাষা-সংস্কৃতি ও অধিকার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

Carlson, B., & Dreher, T. (2018). *Introduction: Indigenous innovation in social media*, Media International Australia, 169(1), 16-20. https://doi.org/10.1177/1329878x18803798

Clark, E. V. (2003), *First language acquisition* (pp. 306-307). Cambridge University Press.

Goddard, C. (2001). Conceptual primes in early language development. In M. Pütz & S. Niemeier (Eds.), *Theory and language acquisition* (pp. 193-194). Walter de Gruyter.

লেখক: অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ এবং পরিচালক, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্টাডি সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষা আন্দোলনের চেপে রাখা ইতিহাস (প্রথম পর্ব)

ড. মোহাম্মদ হাননান

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পাকিস্তান আমলে কয়েক দফা আন্দোলন হয়েছে। ১৯৪৭–১৯৫২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে থেমে থেমে আন্দোলনের পরে তা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। এ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নানাজনের হাতেই রচিত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই বামপন্থি লেখক-ইতিহাসবিদ। এদের রচনার একটা প্রবণতা হলো সবকিছু তাদের দ্বারাই হয়েছে এমনটা দেখানো। এরমধ্যে সেসময়ের ছাত্রনেতা এবং পরে জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে খাটো করে দেখা এবং কেউ কেউ তাঁর অবদানকে অস্বীকার করেছে প্রকাশ্যেই। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনে সেসময়ের তেজস্বী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকাটি ছিল অনেকটা অজ্ঞাত। বঙ্গবন্ধু জেলে বসেই ইতিহাসটি লিখেছিলেন। দেখুন উপেক্ষিত ইতিহাসের কয়েকটি পাতা :

> ফেব্রুয়ারি ৮ই হবে, ১৯৪৮ সাল। করাচিতে পাকিস্তান সংবিধান সভার (কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলি) বৈঠক হচ্ছিল। সেখানে রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেই বিষয়ও আলোচনা চলছিল। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লীগ সদস্যেরও সেই মত। কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করলেন বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক। কারণ, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা হল বাংলা। মুসলিম লীগ সদস্যরা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। আমরা দেখলাম, বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস এর প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল, বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আমরা সভা করে প্রতিবাদ শুরু করলাম।

এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস নামে সাংস্কৃতিক সংগঠন যুক্তভাবে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে একটা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করছিল। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু শাখা সবেমাত্র কিছু জেলায় ও মহকুমায় করা হয়েছিল। আর তমদ্দুন মজলিস একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যার নেতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম।

একটি সভায় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি' দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল। জেলায় জেলায় ছাত্রনেতারা বের হয়ে পড়লেন। কলকাতা থেকে অল্প কিছুদিন পূর্বে ঢাকায় আগত ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ঐ তারিখের তিন দিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে আসেন।

এরপর ১১ই মার্চ কীভাবে সংগঠিতভাবে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু:

> ঢাকায় ফিরে এলাম। রাতে কাজ ভাগ হল— কে কোথায় থাকব এবং কে কোথায় পিকেটিং করার ভার নেব। সামান্য কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া শতকরা নব্বই ভাগ ছাত্র এই আন্দোলনে যোগদান করল। জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড, মেডিকেল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিশেষ করে সক্রিয় অংশগ্রহণ করল। মুসলিম লীগ ভাড়াটিয়া গুণ্ডা লেলিয়ে দিল আমাদের উপর। অধিকাংশ লোককে আমাদের বিরুদ্ধে করে ফেলল। পুরান ঢাকার কয়েক জায়গায় ছাত্রদের মারপিটও করল। আর আমরা পাকিস্তান ধ্বংস করতে চাই এই কথা বুঝাবার চেষ্টা করল।

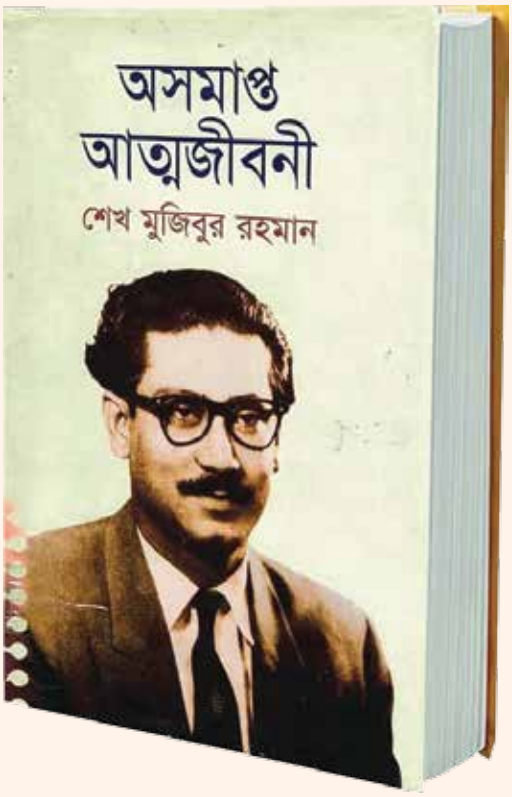

১১ই মার্চ ভোরবেলা শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করল। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কোনো পিকেটিংয়ের দরকার হয়নি। সমস্ত ঢাকা শহর পোস্টারে ভরে গিয়েছিল। অনেক দোকানপাট বন্ধ ছিল, কিছু খোলাও ছিল। পুরান ঢাকা শহরে পুরাপুরি হরতাল পালন করেনি। সকাল আটটায় জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ হয়েছিল। একদল মার খেয়ে স্থান ত্যাগ করার পর আরেকদল হাজির হতে লাগল। ফজলুল হক হলে আন্দোলনকারীদের রিজার্ভ কর্মী ছিল। এইভাবে গোলমাল, মারপিট চলল অনেকক্ষণ। নয়টায় ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনের দরজায় লাঠিচার্জ হলো। খালেক নেওয়াজ খান, বখতিয়ার (এখন নওগাঁর অ্যাডভোকেট), শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. ওয়াদুদ গুরুতরভাবে আহত হলো। তোপখানা রোডে কাজী গোলাম মাহাবুব, শওকত মিয়া ও আরো অনেক ছাত্র আহত হলো। আবদুল গনি রোডের দরজায় তখন আরো ছাত্র জুলুম ও লাঠির আঘাত সহ্য করতে না পেরে সরে পড়ছিল।

মুজিব লিখেছেন,

> আমি জেনারেল পোস্ট অফিসের দিক থেকে নতুন কর্মী নিয়ে ইডেন বিল্ডিংয়ের দিকে ছুটেছি, এর মধ্যে শামসুল হক সাহেবকে ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। গেট খালি হয়ে গেছে। তখন আমার কাছে সাইকেল। আমাকে

গ্রেফতার করার জন্য সিটি এসপি জিপ নিয়ে বারবার তাড়া করছে, ধরতে পারছে না। এবার দেখলাম উপায় নাই। একজন সহকর্মী দাঁড়ানো ছিল তার কাছে সাইকেল দিয়ে চার পাঁচজন ছাত্র নিয়ে আবার ইডেন বিল্ডিংয়ের দরজায় আমরা বসে পড়লাম এবং সাইকেল যাকে দিলাম তাকে বললাম, শীঘ্রই আরও কিছু ছাত্র পাঠাতে। আমরা খুব অল্প, টিকতে পারব না।

আমাদের দেখাদেখি আরও কিছু ছাত্র ছুটে এসে আমাদের পাশে বসে পড়ল। আমাদের উপর কিছু উত্তম মধ্যম পড়ল এবং ধরে নিয়ে জিপে তুলল। হক সাহেবকে পূর্বেই জিপে তুলে ফেলেছে। বহু ছাত্র গ্রেফতার ও জখম হল। কিছু সংখ্যক ছাত্রকে গাড়ি করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে আসল। কয়েকজন ছাত্রীও মার খেয়েছিল। অলি আহাদও গ্রেফতার হয়ে গেছে। তাজউদ্দীন, তোয়াহা ও অনেককে গ্রেফতার করতে পারে নাই। আমাদের প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরজনকে বেঁধে নিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যার সময়। ফলে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। ঢাকার জনগণের সমর্থনও আমরা পেলাম।

তখন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার অধিবেশন চলছিল। বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা রোজই হচ্ছিল। খাজা নাজিমউদ্দীন দেখলেন আন্দোলন দানাবেঁধে উঠেছে। এই সময় শেরে বাংলা, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী, ডা. আবদুল মালেক, খান আবদুস সবুর, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন ও আরো অনেকে মুসলিম লীগ পার্টির বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন ও প্রতিবাদ করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দলও এক হয়ে গেছে। খাজা নাজিমউদ্দীন ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলাপ করতে রাজি হলেন। মুজিব লিখেছেন,

আমরা জেলে, কি আলাপ হয়েছিল জানি না। তবে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দিন সাহেব জেলে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বললেন, নাজিমুদ্দীন সাহেব এই দাবিগুলি মানতে রাজি হয়েছেন : এখনই পূর্ব পাকিস্তানের অফিসিয়াল ভাষা বাংলা করে ফেলবে। পূর্ব পাকিস্তান আইনসভা থেকে সুপারিশ করবেন, যাতে কেন্দ্রে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয়। সমস্ত মামলা উঠিয়ে নিবেন, বন্দিদের মুক্তি দিবেন এবং পুলিশ যে জুলুম করেছে সেই জন্য তিনি নিজেই তদন্ত করবেন। ...

আমাদের ১১ তারিখে জেলে নেওয়া হয়েছিল, আর ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় মুক্তি দেওয়া হয়। জেলগেট থেকে শোভাযাত্রা করে আমাদের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে নিয়ে যাওয়া হল।...

মুজিব তখন মুক্ত। ১৬ই মার্চ সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভায় তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় মুজিবের এই প্রথম সভাপতিত্ব করা। অনেকেই বক্তৃতা করেন। সংগ্রাম পরিষদের সাথে যেসব শর্তের ভিত্তিতে আপোশ হয়েছে তার সকলগুলোই সভায় অনুমোদন করা হয়। তবে সভা খাজা নাজিমউদ্দীন যে পুলিশি জুলুমের তদন্ত করবেন, তা গ্রহণ করেনি; কারণ খাজা নাজিমউদ্দীন নিজেই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মুজিব বক্তৃতায় বলেন, 'যা সংগ্রাম পরিষদ গ্রহণ করেছে, আমাদেরও তা গ্রহণ করা উচিত। শুধু আমরা ঐ সরকারি প্রস্তাবটা পরিবর্তন করতে অনুরোধ করতে পারি, এর বেশি কিছু না'। কিন্তু এর মধ্যে এ সিদ্ধান্তের বাইরে কেউ কেউ হঠকারী কাজ করছিল।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখে খ্যাত হয়েছেন বদরুদ্দীন উমর। তিনি ১৯৪৮ সালের ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় শেখ মুজিবের সভাপতিত্ব করা নিয়ে উপহাস করেন। তিনি লিখেছেন,

১৬ই মার্চ সকালে নয়টার দিকে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি বৈঠকে পূর্বদিন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির কয়েকটি স্থান সংশোধনের পর দুপুরের দিকে সেই সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণ ছাত্রসভায় পেশ করে তাঁদের অনুমোদন লাভেরও সিদ্ধান্ত হয়।

... তফজ্জল আলী ফজলুল হক হলে এসে সংগ্রাম কমিটির কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দীন আহমদ প্রভৃতির সাথে এ নিয়ে আলাপ করেন। তাঁকে সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে নাজিমুদ্দীনকে বলতে বলা হয় যে আন্দোলনের উপর তাঁদের সম্পূর্ণ হাত নেই। আন্দোলন এখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে যেখান থেকে সহজে তা হঠাৎ প্রত্যাহার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই বেলা দেড়টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান কালো শেরওয়ানি এবং জিন্নাহ টুপি পরিহিত হয়ে একটি হাতলবিহীন চেয়ারে সভাপতির আসন অধিকার করে বসেন।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় মহান ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ঐতিহাসিক সভা

...প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ার পর অলি আহাদের মাধ্যমে সেটি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রস্তাব গ্রহণের পর মুজিবুর রহমান অন্য কাউকে বক্তৃতার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বক্তৃতা শুরু করেন। সেই এলোপাথাড়ি বক্তৃতার সারমর্ম কিছুই ছিলো না। অল্পক্ষণ এইভাবে বক্তৃতার পর তিনি অন্য কাউকে বক্তৃতার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ, 'চলো চলো অ্যাসেমব্লি চলো' বলে শ্লোগান দিয়ে সকলকে মিছিল সহকারে পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানান। সেদিনকার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী মিছিলের কোন কথা ছিলো না। কিন্তু এই হঠাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতির পর মিছিলকে বন্ধ করার কারো পক্ষে সম্ভব হলো না। কাজেই ছাত্রেরা সরকার বিরোধী এবং বাংলা ভাষার সমর্থনে নানা প্রকার ধ্বনি দিতে দিতে পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হলো।[২]

এই অনৈতিহাসিক তথ্যের বিপরীতে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় অলি আহাদের লেখায়। তিনি স্বাভাবিকভাবে লিখেছেন,

আন্দোলনে যাহাতে ফাটল বা অনৈক্য সৃষ্টি হইতে না পারে, সেই জন্য আমরা ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেল-তলায় এক সাধারণ

ভাষা শহিদ বরকতের সমাধিতে মোনাজাতরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ছাত্রসভা আহ্বান করি। সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। ...কম্যুনিষ্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন কর্মীবৃন্দ এই সাধারণ ছাত্র সভাকে বানচাল করিতে নানাভাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।[২]

অলি আহাদ খুব গর্বের সঙ্গে লিখেছেন, 'সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন'। অলি আহাদের এ মন্তব্যই অগ্রগণ্য, কারণ এ আন্দোলনের প্রধান নেতাদের মধ্যে অলি আহাদ ছিলেন অন্যতম। বদরুদ্দীন উমরও তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, 'সভার প্রস্তাবনাগুলো অলি আহাদই পরিষদ ভবনে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেন। অলি আহাদ গুরুত্বপূর্ণ না হলে তাঁকে দিয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছাত্রসমাজ করাত না।'

বদরুদ্দীন উমরের এরকম মন্তব্য ও উপহাস ইতিহাস-লেখকোচিতও নয়। ব্যক্তি বিদ্বেষ দ্বারা ইতিহাস লেখকের প্ররোচিত হওয়া ঠিক নয়। তাহলে ইতিহাস লেখক এবং তাঁর রচিত ইতিহাসও একপেশে ও জনবিচ্ছিন্ন থাকবে। সেদিনের ইতিহাসের বাকি অংশ হলো এই যে,

> ছাত্ররা দাবি করল, শোভাযাত্রা করে আইন পরিষদের কাছে গিয়ে খাজা সাহেবের কাছে এই দাবিটা পেশ করবে এবং চলে আসবে। আমি বক্তৃতায় বললাম, তার কাছে পৌঁছে দিয়েই আপনারা আইনসভার এরিয়া ছেড়ে চলে আসবেন। কেউ সেখানে থাকতে পারবেন না। কারণ সংগ্রাম পরিষদ বলে দিয়েছে, আমাদের আন্দোলন বন্ধ করতে কিছুদিনের জন্য। সকলেই রাজি হলেন।
>
> এক শোভাযাত্রা করে আমরা হাজির হয়ে কাগজটা ভিতরে পাঠিয়ে দিলাম খাজা সাহেবের কাছে। আমি আবার বক্তৃতা করে সকলকে চলে যেতে বললাম এবং নিজেও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে চলে আসবার জন্য রওয়ানা করলাম। কিছু দূর এসে দেখি, অনেক ছাত্র চলে গিয়েছে। কিছু ছাত্র ও জনসাধারণ তখনও দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝে মাঝে স্লোগান দিচ্ছে। আবার ফিরে গিয়ে বক্তৃতা করলাম। এবার অনেক ছাত্রও চলে গেল। আমি হলে চলে আসলাম।
>
> প্রায় চারটায় খবর পেলাম, আবার বহু লোক জমা হয়েছে, তারা বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণ, ছাত্র মাত্র কয়েকজন ছিল। শামসুল সাহেব চেষ্টা করছেন লোকদের ফেরাতে। মাঝে মাঝে হলের ছাত্ররা দু'একজন এমএলএকে ধরে আনতে শুরু করেছে মুসলিম হলে। তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নিচ্ছে, যদি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে না পারেন, তবে পদত্যাগ করবেন। মন্ত্রীরাও বের হতে পারছেন না। খাজা সাহেব মিলিটারির সাহায্যে পেছন দরজা দিয়ে ভেগে গিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুও তাঁর আত্মজীবনীতে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বলতে গিয়ে কাহিনিটি উল্লেখ করেছেন। আমরা দেখব বঙ্গবন্ধুর এ তথ্য একেবারেই নির্ভুল ছিল। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার (জিওসি) ছিলেন পরবর্তীকালের ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। তিনি তাঁর রাজনৈতিক আত্মজীবনীতেও সেদিনের এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন :

> অন্য একটি পরিস্থিতিতেও আমাদের বেসামরিক শক্তিকে সাহায্য করতে হয়েছিল। খাজা নাজিমউদ্দীন আমাকে আহ্বান করেন ... তিনি চাচ্ছিলেন যে, ছাত্রদের আক্রমণ থেকে আমি পরিষদকে রক্ষা করি। আমার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করা উচিত ছিল কারণ এটা আসলে পুলিশের কাজ, কিন্তু আমার এই দুশ্চিন্তা ছিল যে যদি শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে তাহলে ব্যাপকভাবে আন্দোলন এবং স্বৈরাচার শুরু হবে। আমি মেজর পীরজাদার অধীনে একদল পদাতিক সৈন্যকে পরিষদের কাছে থাকার জন্য নির্দেশ দিলাম যাতে প্রয়োজন হলে পুলিশকে তারা সাহায্য করতে পারে।
>
> ... আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল ছাত্ররা যদি সৈনিক দলের উপর এসে চড়াও হয়, তাহলে তাদের গুলি ছোঁড়া ছাড়া উপায় নাই। এটা আমি কোনক্রমেই ঘটতে দিতে চাই না। সুতরাং আমি পরিষদে যাওয়া স্থির করলাম। আমি জীবনে এ রকম বিশৃঙ্খলা দেখিনি। এদিকে মারমুখী এবং উত্তেজিত পরিষদের মধ্যে উজিরে আলা চিৎকার করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর বাইরে ছাত্ররা তাদের জীবনের চূড়ান্ত উত্তেজনা উপভোগ করছিল। পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট ওবায়দুল্লাহ্ সেখানে কার্যরত ছিলেন। ...
>
> আমি পীরজাদাকে উজিরে আলার গাড়ী পরিষদ গৃহের পেছনের দিকে আনতে বললাম এবং আমরা দুজনে সবার চোখে ধূলো দিয়ে উজিরে আলাকে বাবুর্চিখানার মধ্য দিয়ে পার করে দিয়ে এলাম। এই অসাধারণ কার্যটি সুসম্পন্ন করার পর আমি বেরিয়ে এলাম এবং ছেলেদেরকে বললাম, 'পাখী উড়ে গেছে।' সকলে হো হো করে হেসে উঠলো এবং সমস্ত পরিস্থিতি যা এক মুহূর্ত পূর্বেও উত্তেজনা ও সঙ্কটপূর্ণ ছিল তা হাস্যোজ্বল হয়ে হাল্কারূপ ধারণ করলো।[৩]

১৯৪৮ সালের এ ভাষা আন্দোলনের উপর বঙ্গবন্ধু আরো লিখেছেন, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন শুধু ঢাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল'। ফরিদপুর ও যশোরে কয়েকশত ছাত্র গ্রেফতার হয়েছিল। রাজশাহী, খুলনা, দিনাজপুর ও আরো অনেক জেলায় আন্দোলন হয়েছিল। সরকার ও মুসলিম লীগ সমর্থক নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ চেষ্টা করেছিল এই আন্দোলনকে বানচাল করতে, কিন্তু পারেনি। এই আন্দোলন ছাত্ররাই শুরু করেছিল, আন্দোলনের পরে দেখা গেল জনসাধারণও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে বদ্ধপরিকর– বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীরাও একে সমর্থন দিয়েছিল। এটা আন্দোলনের একটা বিশেষ দিক।

এখানে এ আন্দোলনের ইতিহাস ও ঘটনার বিবরণ লিখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু ভাষা সম্পর্কে যে যুক্তি ও বিতর্ক উপস্থাপন করেন তা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন,

> বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তবুও আমরা বাংলা ও উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলাম। ...
>
> শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মভীরু মুসলমানদের ইসলামের কথা বলে ধোঁকা দেওয়া যাবে ভেবেছিল, কিন্তু পারে নাই। যে কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোনো কালে সহ্য করে নাই। এই সময়ে সরকারদলীয় মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুর জন্য জান মাল কোরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু জনসমর্থন না পেয়ে একটু ঘাবড়িয়ে পড়েছিলেন। তারা শেষ 'তাবিজ' নিক্ষেপ করলেন। জিন্নাহকে ভুল বোঝালেন। এরা মনে করলেন, জিন্নাহকে দিয়ে উর্দুর পক্ষে বলাতে পারলেই আর কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাবে না। জিন্নাহকে দলমত নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর যে কোন ন্যায়সঙ্গত কথা মানতে সকলেই বাধ্য ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনমত কোন পথে, তাঁকে কেউই তা বলেন নাই বা বলতে সাহস পান নাই।

১৯শে মার্চ জিন্নাহ ঢাকা আসলে হাজার হাজার লোক তাকে অভিনন্দন জানাতে তেজগাঁও বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিল। ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে এসে রেসকোর্স মাঠে বিরাট সভায় ঘোষণা করলেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।' প্রায় চার-পাঁচ শত ছাত্র এক জায়গা থেকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছিল– 'মানি না'। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি যখন আবার বললেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'– তখন ছাত্ররা তার সামনেই চিৎকার করে বলে উঠেছিল– 'না, না, না'। জিন্নাহ প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন, তারপর বক্তৃতা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'এই প্রথম তার মুখের উপরে তার কথার প্রতিবাদ করল বাংলার ছাত্ররা। এরপর জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন আর কোনোদিন বলেন নাই, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'।

জিন্নাহর ঢাকা পর্বের ঘটনাও লিখেছেন বঙ্গবন্ধু,

> জিন্নাহ চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরে ফজলুল হক হলের সামনে এক ছাত্রসভা হয়। তাতে একজন ছাত্র বক্তৃতা করেছিল, তার নাম আমার মনে নাই। তবে সে বলেছিল, "জিন্নাহ যা বলবেন, তাই আমাদের মানতে হবে। তিনি যখন উর্দুই রাষ্ট্রভাষা বলেছেন তখন উর্দুই হবে।" আমি তার প্রতিবাদ করে বক্তৃতা করেছিলাম, আজও আমার এই একটা কথা মনে আছে। আমি বলেছিলাম, "কোন নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। যেমন হযরত ওমরকে (রা.) সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বড় জামা পরেছিলেন বলে।[৪] বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।" সাধারণ ছাত্ররা আমাকে সমর্থন করল।

ভাষা শহিদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের একটা বড়ো প্রভাব পড়েছিল ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রসমাজের মধ্যে। নিয়মিতই এরপর পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও যুবকরা ভাষার দাবি নিয়ে সভা ও শোভাযাত্রা করে চলল। দিন দিন জনমত সৃষ্টি হতে লাগল।

বদরুদ্দীন উমর একজন বামপন্থি রাজনীতিক। তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বামপন্থিদের ভূমিকা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এক উদ্ভট ইতিহাস লিখলেন, যার অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যারাই রচনা করতে গিয়েছেন, ঐ উমরকেই অনুসরণ করেছেন, বামপন্থিদের ভূমিকাকে উচ্চকিত করেছেন। ভাষা-আন্দোলনের এ ধাঁচের ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল, এ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে লঘু করে দেখানো, কতকক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর কোনো ভূমিকাই ছিল না– এমনটা দেখানোই মূল উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বের হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী এ আন্দোলনের ভেতরের সকল ইতিহাসকেই নির্মোহভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. বদরুদ্দীন উমর : *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩।

২. অলি আহাদ : *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫*, (প্রকাশনার তারিখ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নাম অনুল্লেখিত), পৃষ্ঠা ৫৯।

৩. মুহম্মদ আইয়ুব খান : *প্রভু নয় বন্ধু*, একটি রাজনৈতিক আত্মজীবনী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি-ঢাকা-লাহোর, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯।

৪. এ মন্তব্যে বঙ্গবন্ধুর বিশুদ্ধ হাদিসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি ছিল সত্য। ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু ইসলামের ঘটনা দিয়েই এর উত্তর দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) একবার মদিনা মনোয়ারার জনগণকে টুকরো কাপড় সমভাবে ভাগ করে দেন। ঐ কাপড়ের টুকরো এমন ছিল না যাতে কেউ বড়ো জামা বানাতে পারে। কিন্তু ওমর (রা.) ঐ কাপড় দিয়ে বড়ো জামা বানালে লোকের সন্দেহ জাগে ও তাঁকে প্রশ্ন করে যে কীভাবে তিনি ঐ কাপড় দিয়ে বড়ো জামা বানালেন। ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এই সন্দেহ দূর করেন এই বলে যে, তিনি তাঁর ভাগের কাপড়টি পিতাকে দান করেছেন, যাতে তিনি বড়ো জামা বানাতে পারেন।

লেখক: গ্রন্থকার ও গবেষক

ভাষাসম্পদ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার

রফিকুর রশীদ

মাঝে মধ্যে ভাবনা হয়– ভাষার মতো এমন শক্তিশালী এবং আশ্চর্য দ্যুতিময় হাতিয়ার আর কী আছে মানুষের? আপন বুদ্ধি খাটিয়ে আপন অস্তিত্বের সম্প্রসারণ এবং অন্যের উপরে আধিপত্য বিস্তার ঘটানোর জন্য মানুষ এ নাগাদ কত কিছুই না করেছে। পুরাতন অস্ত্র বাতিল করে গবেষণালব্ধ নতুন অস্ত্রে শাণ দিয়েছে, বিদ্যমান সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপরে স্থাপন করেছে উন্নততর মানবিক গুণসমৃদ্ধ নতুন বিধান ও ব্যবস্থার আলোকোজ্জ্বল সৌধ; কিন্তু মানুষের বুকের গভীরে স্থায়ী আসন পাতার জন্যে ভাষার চাবি দিয়েই খুলতে হয়েছে রুদ্ধদুয়ার। পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সেই সত্যের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। তাই প্রশ্ন জাগে– মানুষ কবে কোথায় কেমন করে সন্ধান পেয়েছে ভাষাসম্পদের? হ্যাঁ, ভাষাও এক প্রকার সম্পদ বই কী! দুনিয়ার সমুদয় বস্তুগত সম্পদের তুলনায় ভাষাসম্পদের মূল্য কম কিছু নয়। ভাষার জন্যে প্রাণবাজি রাখা সংশপ্তক জাতি হিসেবে বাঙালি সেই ভাষাসম্পদের অন্তর্নিহিত মূল্য যথেষ্ট বোঝে। সত্যি বলতে কি অন্য অনেক জাতির চেয়ে খানিক বেশিই বোঝে। তাই পাকিস্তানি শাসনামলে বস্তুগত সম্পদের ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হবার ক্ষোভে জ্বলে উঠবার অনেক আগেই, পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই সেই রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক বাঙালি অগ্নিগিরির মতো উত্তাল বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠে ভাষার প্রশ্নে, ভাষাসম্পদের উপরে অধিকার হারানোর উৎকণ্ঠায়। অবশ্য কেবল পাকিস্তানি জামানা বলে তো নয়, বাংলা ভাষার এ এক নির্মম নিয়তিই বটে। জন্ম থেকেই তাকে লড়তে হয়েছে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে, নানাবিধ বৈরিতার কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়েই তাকে আসতে হয়েছে আজকের পর্যায়ে। তার অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদই হয়তবা তাকে শক্তি সাহস প্রেরণা জুগিয়েছে। অনুমান করি, সে কারণেই চর্যাপদের রচয়িতা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাষ্ট্রীয় জুলুমের মুখে দেশত্যাগ করেছে, কিন্তু ভাষাসম্পদ কিছুতেই ছাড়েনি।

মানুষ কীভাবে পেল ভাষার নাগাল? বেশ তো চলছিল আকারে, ইঙ্গিতে, ইশারায়-ভঙ্গিতে। মানুষ কখন টের পেল যে– না, এই ইশারা-ইঙ্গিতে তার চলছে না, মন ভরছে না; তার আরো চাই, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার' মতো ধ্বনি চাই। ধ্বনিপুঞ্জের গুঞ্জন চাই। বাকযন্ত্রের এমন নিপুণ ব্যবহার সে শিখল কোথায় বটেই তো, ভাষার মতো এমন বিস্ময়কর আবিষ্কার আর কীইবা আছে!

ভাষা কি তবে ঝরে পড়া নক্ষত্রের মতো টুপটাপ খসে পড়ে আকাশ থেকে? আহা, আক্ষরিক অর্থে ভাষা না হোক, ভাষার শরীরে খচিত শব্দরাজি কিংবা শব্দের ধ্বনিপুঞ্জ কি নক্ষত্রের চেয়ে কম কিছু উজ্জ্বল? জ্যোতিষ্কপ্রায় উজ্জ্বল ধ্বনিপুঞ্জ যদি আকাশ থেকে খসে না-ই পড়ে, তাহলে ভাষার পুষ্পমঞ্জরি কি সবার অলক্ষ্যে মাটি থেকে উত্থিত হয়? মাটি ফুড়ে নানাবিধ বীজকে অঙ্কুরিত হতে দেখেছি নানাবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে, তাই বলে ভাষাবৃক্ষও কি অঙ্কুরিত হবে মৃত্তিকার গভীর থেকে? ভাষাকে কেউবা তুলনা করেছেন নদীর সঙ্গে, কেউবা ফোটা ফুলের সঙ্গে। যুক্তি দুই পক্ষেই আছে, আবার তর্কও আছে। পাথর ছড়ানো বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে নদী চলে যায় দূর থেকে বহুদূরে। যেতে যেতে বাঁক বদল, গতি পরিবর্তন, আকার-আকৃতি এমনকি নদীর নাম বদলও ঘটে থাকে। সে কথা তো ভাষার বেলাতেও প্রযোজ্য। ভাষার ভূগোলও নদীর মতোই সম্প্রসারিত হয় (ক্ষেত্রবিশেষে সংকুচিতও হয় বটে), ডালপালা ছড়ায়, ঝরাপাতার মাঝেও আবার নব কিশলয় হয়ে জেগে ওঠে, পত্রপল্লবে ভরে ওঠে কানায় কানায়। হ্যাঁ, ফুল ফোটার সঙ্গেও ভাষা বিকাশের তুলনা হতে পারে। সব ফুলের অভিন্ন বর্ণ গন্ধ নিশ্চয় থাকে না। বনে বনে ফুলের ভিন্নতা যেনবা দেশে দেশে ভাষার বৈচিত্র্যের সঙ্গেই তুলনীয়। ফুলের যেমন সৌন্দর্য সুষমা আছে, প্রত্যেক ভাষার অভ্যন্তরেও আছে তেমনই বিচিত্র আয়োজন। ভাষার সৌন্দর্য তার ধ্বনিতে, শব্দে, অনুপ্রাসে; ছন্দ-অলঙ্কারে, প্রবাদ, প্রবচনে। সৃজনশীল শিল্পী-সাহিত্যিকের সংস্পর্শে ও চর্চায় সে সৌন্দর্য আরো বিকশিত হয়, হতে পারে।

এই যে সৌন্দর্যমণ্ডিত সুষমাপূর্ণ বিকশিত রূপ, এটাই ভাষাকে সম্পদে রূপান্তরিত করে তোলে। এভাবেই ভাষা হয়ে ওঠে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। বিশ্বসভায় গুণী মানুষের মাঝে এভাবেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় ভাষা। অবশ্য যে-কোনো ভাষার মানসম্মান কেবল ওই ভাষায় কথা- বলা লোকের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপরই নির্ভর করে না, এ আবার অন্য লড়াই, ব্যাপারটা ভাষা-রাজনীতির এবং ভাষা-উপনিবেশের। থাক সে প্রসঙ্গ। এ আলোচনা ডালপালা মেলতে মেলতে বহু দূর বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে। বেরিয়ে আসতে পারে অন্ধকার কোনো অধ্যায়। মাতৃভাষার জন্যে বাঙালির আত্মোৎসর্গের মহত্তম ঘটনা ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভের পরও জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অনুমতি আদায়ের দৌড়ে বাংলা ভাষার যথোপযুক্ত অগ্রগতি না হবার পেছনে আছে আন্তর্জাতিক ভাষা-রাজনীতির সক্রিয় উপস্থিতি। কিন্তু আমরা সে আলোচনাতেও যাব না।

প্রত্যেক ভাষার দুয়ার খুলতে হয় তার নিজস্ব চাবিকাঠি দিয়ে। একই দেশে একাধিক ভাষাভাষী মানুষের বাসও হতে পারে। খুব পাশাপাশি বাস, তবু ভিন্ন ভাষার ভেতর বাড়ির দরজা খুললে তো মানুষ এত বড়ো চাবির গোছা পাবে কোথায়? আবার একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন ডালপালাও থাকতে পারে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেই ডালপালার মধ্যেও রচিত হতে পারে অচেনা দূরত্ব। উপভাষা, লোকভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা– যে নামেই ডাকি না কেন, পার্থক্য তাদের মধ্যে অবশ্যই আছে, দুর্বোধ্যতার দূরত্বও কিন্তু কম কিছু নয়। আমাদের এই ছোট্ট দেশেই চট্টগ্রামের আর বরিশালের কিংবা কুমিল্লার আর কুষ্টিয়ার এবং কী একই সমান্তরালে গড়িয়ে চলে? বোধগম্যতাই যদি যে-কোনো ভাষার গ্রহণযোগ্যতার প্রধান

শর্ত হয় তাহলে এই যে আমাদের এই বাংলাদেশের পেটের ভেতরে বসে জন্মসূত্রে সবাই বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে জানানো হচ্ছে আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা; মাতৃভাষার এ দাবি কতটা যথার্থ? মাতৃভাষা যদি হয় মায়ের মুখের ভাষা এবং মায়ের মতো মমত্বময় মধুমাখা সহজবোধ্য ভাষা, তাহলে সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের মায়েদের মুখে অনায়াসে প্রচলিত ভাষাভঙ্গিটির দিকে কান পাততে হয়, কী বলেন দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই সব প্রান্তিক মায়েরা? কী ভাষায় আশীর্বাদ করেন তার সন্তানদের? সে ভাষার নাম কী? বাংলা ভাষা? বাংলা তো বটেই, কোন আলঙ্কারিক পরিচয়ে উপস্থাপন করব তাকে– মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা, নাকি জাতীয় ভাষা? মায়ের মুখে উচ্চারিত ভাষার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত নাম 'মাতৃভাষা'; তা সারা দেশের সব অঞ্চলের লোকজন বুঝুক অথবা না-ই বুঝুক, সন্তান বুঝলেই হলো। মাতৃভাষা তো প্রধানত সন্তানের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যেই।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা খানিকটা আলাদা, অনেকটা বড়ো মাপের বিষয়। আর আঞ্চলিক বা খণ্ডিত পরিচয় নয়, পরিচয় সারা দেশের, গোটা জাতির। দেশের নাম বাংলাদেশ। জাতির নাম বাঙালি জাতি, জাতীয় ভাষার নাম বাংলা ভাষা। হ্যাঁ, বৃহত্তর অর্থে মাতৃভাষাও বটে। কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল, সিলেটে জন্মগ্রহণকারী মায়ের আদলে গোটা দেশের মানচিত্রের ছাপ বসিয়ে দেখলেই হলো। দেশকে মা বলে ডাকতে শিখেছি আমরা অনেক আগেই। রাষ্ট্র যখন দেশমাতা বা মাতৃভূমি, তখন তার ভাষা তো মাতৃভাষা হবেই। মাকে যেমন সর্বজনীন হতে হয়, সব সন্তানের প্রতি সমান যত্নশীল ও মমত্বময় হয়ে উঠতে হয়, মাতৃভাষার ব্যাপারটাও সেই রকমই। সকল আঞ্চলিকতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বরং আঞ্চলিক লোকভাষার বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে সত্যিকারের মাতৃভাষা হয়ে উঠতে পারে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর।

যে-কোনো ভাষার কৃতি সন্তান তার শিল্পী, সাহিত্যিকেরা মাতৃভাষার যথার্থ নাড়ির স্পন্দন ঠিকই ধরতে পারেন। তাদের হাতে যখন রচিত হয় মহৎ সাহিত্য, তখন সেই সাহিত্যে ব্যবহৃত লোকভাষাও আঞ্চলিক ভাষার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সর্বজনীন মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। তার প্রমাণ আমরা প্যারীচাঁদের *আলালের ঘরে দুলাল* এ না পেলেও দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* থেকেই পেয়ে আসছি। নীলকর উড সাহেব যখন নীল চাষের জন্য শ্যামচাঁদের আঘাতে সাধুচরণকে জর্জরিত করে তোলে, তখন রাইচরণ সক্রোধে বলে– 'দাদা, তুই চুপ দে। ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে। ক্ষিধের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন ডাগ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।' অথবা ইজ্জত হারানোর ভয়ে তটস্থ ক্ষেত্রমণির আর্তনাদ কি কিছুতেই বিস্মরণযোগ্য– 'ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও। পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটয়ে দাও। আদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না।' সংলাপের এই ভাষা কুষ্টিয়া-যশোরের (নদীয়ারও) আঞ্চলিক বা লোকভাষা হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় ভাষা বা প্রমিত ভাষা থেকে মোটেই দূরবর্তী নয়। আবার *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাসে নদীতীরে কুবেরের হাতে তামাক তুলে দেবার সময় কপিলা হাসি মুখে বলে, 'তামুক ফেইলা আইছ মাঝি'। তামাকের দলা গ্রহণ করে কুবের বলে, 'খাটাসের মত হাসিস ক্যান কপিলা, আঁই?' কপিলা বলে, 'ডরাইছিলা, হ? আরে পুরুষ!' তারপরই রহস্যময় প্রস্তাব 'আমারে নিবা মাঝি লগে?' এই সংলাপ শুনতে বা পড়তে গিয়ে পাঠক কি কখনোই পদ্মাপারের লোকভাষার কারণে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন? আঞ্চলিক উচ্চারণের শেকড়বাকড়ে পাঠককে কি আটকে পড়তে হয়? অথবা যদি আরো সাম্প্রতিককালের অনবদ্য সৃষ্টি *নূরলদীনের সারাজীবন*-এর কথাই ধরি, সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের কলমে যখন লেখা হয়– 'জাগো বাহে কোনঠে সবাই' তখন আর সেই কালজয়ী সংলাপ উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিকতার ফাঁদে আটকা থাকে না; হয়ে ওঠে সর্বজনীন। রংপুর কুড়িগ্রামের জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত এবং প্রচলিত লোকভাষায় রচিত অমর কাব্যনাট্য *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* অথবা *নূরলদীনের সারাজীবন* এভাবেই আঞ্চলিক ভাষার সমস্ত সুষমা এবং প্রাণশক্তি বক্ষে ধারণ করে হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্য। সত্যি বলতে কি জাতীয় সাহিত্যে এই গ্রহণ ক্ষমতার উদ্‌বোধন ঘটে দক্ষ শিল্পীর হাত ধরে। যেমন মরমি শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠ ছুঁয়ে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া হয়ে ওঠে সর্ববঙ্গের সম্পদ।

শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা পৃথিবীর যে-কোনো অঞ্চলের সাধারণ মানুষ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত লোকভাষাতেই প্রাত্যহিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে এমনকি স্বপ্ন দেখা বা স্বপ্ন রচনার মতো

কাজও অবলীলায় সম্পাদিত হয় ওই ভাষাতেই। প্রচলিত এ ভাষার ঐশ্বর্য প্রমিত তথা জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে কীভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে, সে উদাহরণও আমরা দেখেছি। বাংলা ভাষা তার জন্মলগ্ন থেকেই প্রকৃতিলগ্ন প্রাকৃতজনের মুখের ভাষাকে উচ্চ মর্যাদায় গ্রহণ করেছে, কাজেই আজকের দিনে লোকভাষাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু হাজার বছরের পরিচর্যা ও পথপরিক্রমায় বর্তমানে বাংলা ভাষার যে প্রমিত রূপ দাঁড়িয়েছে, তার সর্বজনমান্য মান বাংলাভাষী সবার জন্যেই প্রযোজ্য। অথচ কোনো শিক্ষিত বাঙালিকে যখন সেই প্রমিত বাংলা ভাষায় দু চার মিনিট কথা বলতে কিংবা দু চার পঙ্‌ক্তি গদ্য লিখতে গিয়ে হাপিয়ে উঠতে দেখি, তখন দুঃখের আর অবধি থাকে না। হয়ত তিনি ইংরেজিতে যথেষ্ট দক্ষ। ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান উচ্চারণ রীতিও অনেক সাধনায় রপ্ত করেছেন অথচ বাংলা লিখতে গিয়ে অসংখ্য বানান ভুলে আকীর্ণ, সাধু-চলিতের মিশ্রণদোষে দুষ্ট, ক্রিয়াপদের রূপচেহারা ভেঙেচুরে একাকার করে বসেন। ভুল ধরিয়ে দিতে গেলেও নির্বিকারচিত্তে আকর্ণবিস্তৃত হাসির মধ্যে জানান– 'আরে ভাই, ওই তা হলো, মাতৃভাষায় কথাটা বুঝানো গেলেই হলো।' হায় মাতৃভাষা প্রীতি আর এই শ্রেণির শিক্ষিতজনের মুখের কথা শুনলে তো অবাক হতে হয়, ভাবনায় চোখ কপালে ওঠে– এমন ধোপদুরস্ত ঝকঝকে ভদ্রলোকের মুখ থেকে এ কী বেরুচ্ছে– প্রমিত বাংলা ভাষার এ কী বেহাল দশা! লোকভাষা উচ্চারণের ক্ষেত্রে এমনই গ্রাম্যতায় আচ্ছন্ন যে গোটা শিক্ষাজীবনে বুঝিবা প্রমিত উচ্চারণের প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগী হবারও অবকাশ ঘটেনি।

আমার তো মনে হয় একজন শিক্ষিত মানুষের পক্ষে এবং নানাবিধ প্রয়োজনে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্ক এবং সংযমী হওয়া বেশ জরুরি। তিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, যে ধুলোমাটি মেখে বড়ো হয়েছেন, সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় অবশ্যই তাকে গ্রহণ করতে হবে সেই এলাকায় প্রচলিত লোকজ ভাষাভঙ্গিটি; কেননা বাংলা ভাষার প্রমিত রূপটিও তাদের কাছে ভয়ানক দূরত্ববহ। কাজেই প্রাণের স্বজনকে তিনি দূরে ঠেলবেন কেন এবং কী করে? পেশাগত জীবনে তিনি যদি স্কুল-কলেজের শিক্ষক হন, তাহলে ক্লাসরুমে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক মানেই অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁকে মনে রাখতে হবে ক্লাসরুমের মধ্যে তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন সমগ্র শিক্ষক সমাজের। একই গ্রামের মানুষ হয়েও ক্লাসরুমে তিনি অন্য মানুষ, আলাদা মানুষ, তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে শত-সহস্র শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং আরো অনেকে; কাজেই ক্লাসরুমে তাঁর ব্যবহারের ভাষাভঙ্গিটি তো প্রমিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষিত মানুষটি যদি হন কোনো অফিসকর্তা, তাহলেও তাকে ভাষা ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে সহকর্মীদের সঙ্গে বাক্যালাপ কিংবা অফিস নোট লেখার সময়। তিনি যদি হন রাজনীতিবিদ, তাহলে মাঠে ময়দানে বক্তৃতা আর পার্লামেন্টের বক্তৃতার ভাষাভঙ্গি একাকার করে ফেললে চলবে না। অশুদ্ধ উচ্চারণ এবং অশুদ্ধ বানানের মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে, তা সকলের কাছে শ্রদ্ধাপূর্ণ না হবার আশঙ্কাই অধিক।

বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ করছি, আমাদের রাজধানী শহরের ভাষা পালটে যাচ্ছে। ঢাকার ভাষা ঢাকাইয়াও থাকতে চাইছে না। যা চলছে তাকে আদি ও অকৃত্রিম ঢাকাইয়া ভাষা বলা যাবে না কিছুতেই। অদ্ভুত এক জগাখিচুড়ি ককটেল ভাষা। অদ্ভুত এর শব্দভাণ্ডার, বিচিত্র এর ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং বড়োই বিচিত্র এর উচ্চারণভঙ্গি। এই ভাষা কবে, কোত্থেকে, কীভাবে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে তা নিয়ে উচ্চস্তরের গবেষণা চলতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সে গবেষণা আলোর মুখ দেখবে। কিন্তু আমি কিছুতেই নির্ণয় করে উঠতে পারি না– বাংলা ভাষার এ কোন রূপ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে এবং টিভি-সিরিয়ালে দোর্দণ্ড প্রতাপে উপস্থিত এই ভাষা। শেষ পর্যন্ত এই খিচুড়িভাষা যে কত দূরে হানা দেয়, তাও দেখার বিষয়। তবে এ ভাষার উত্তাপ প্রমিত বাংলার উপরেও যেমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, একইসঙ্গে তা এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকভাষাকেও প্রভাবিত করে চলেছে। অন্ধকারের এই হাতছানি থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ও করণীয় উদ্ভাবনে অচিরেই পণ্ডিতদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

আমাদের ছোট্ট এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলব্যাপী ছড়ানো লোকভাষার বৈচিত্র্য কিন্তু তার ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনার ইঙ্গিতই বহন করে। এ ভাষা ব্যবহারের শৈল্পিক নৈপুণ্যই পারে কালোত্তীর্ণ মহৎ সৃষ্টির সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে তুলতে। এভাবে লোকভাষার নির্যাস থেকেই পরিপুষ্টি সাধন ঘটতে পারে জাতীয় ভাষার। আজকের দিনে ঢাকাইয়া টেলিভিশনের নাটকে (জগাখিচুড়ি) ভাষার আগ্রাসন থেকে লোকভাষাসমূহের স্বকীয়তা ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করাও যেমন জরুরি, তেমনি লোকভাষার সঙ্গে জাতীয় ভাষার শিল্পসুষমামণ্ডিত মেলবন্ধন রচনা করাও জাতীয় স্বার্থেই বিশেষ প্রয়োজন।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে প্যালেস্টাইনে সড়ক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে প্যালেস্টাইনের হেবরনের একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্যালেস্টাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ রিয়াদ মালকি। ৯ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান প্যালেস্টাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ তথ্য জানান। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ন্যাম সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি সড়কের নামকরণের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ রিয়াদ মালকি আরো জানান, ফিলিস্তিন সরকার বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র আরবি অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশনার কাজ শুরু করেছে।

আম্মানের প্যালেস্টাইন দূতাবাসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান ফিলিস্তিনের পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি বাংলাদেশের নীতিগত সমর্থন ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অটুট রয়েছে। তাঁর যোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই নীতিগত অবস্থান ধরে রেখেছেন। রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অর্জিত বিভিন্ন সাফল্য এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

প্রতিবেদন: সীমান্ত হোসেন

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে ভাষা আন্দোলনের মিছিল

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ

ড. মো. আব্দুস সামাদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য অপরিসীম। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালিরা তাদের পৃথক জাতিসত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়। এই আন্দোলন জন্ম দেয় ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জাতীয় ধ্যানধারণা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সূত্রপাত ঘটে যা পরবর্তী সকল আন্দোলনের পাথেয় হিসেবে কাজ করে। ভাষা আন্দোলন তথা একুশ রোপণ করে বাঙালিদের জাতিসত্তার বীজ। এরই ধারাবাহিকতায় ঘটে যায়– ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৬২ সালের আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, ১৯৬৬-তে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের তালবাহানার প্রেক্ষাপটে ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা ও নয়মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রাম। সব শেষে আসে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন 'স্বাধীনতা'। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বাঙালি জাতি পায় স্বাধীনতা ও বিজয় খচিত লাল-সবুজের পতাকা। মাতৃভাষার প্রতি মমত্ব কীভাবে একটি জাতির জন্ম দেয়; একুশ তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

একুশের ঐতিহাসিক পটভূমি

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় ও ঐতিহাসিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীতে বহুজাতিই তাদের মাতৃভাষার অধিকার বজায় রাখার জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করেছে। কিন্তু বাংলা ভাষার সংগ্রামের মতো সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ হয়ে উঠতে পারেনি। সৃষ্টি করতে পারেনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এতটা গভীরতা। যা কিনা একটি জাতির সর্বাত্মক মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা ও চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। সংস্কৃতি সচেতন বাঙালিকে অনুভব করতে না পেরে অপরিণামদর্শী পাকিস্তান শাসকচক্র আঘাত করেছিল। এ কারণে শাণিত বাঙালির পক্ষে ভাষার প্রশ্নে প্রতিবাদী হওয়া ছিল অবধারিত। এমন উজ্জ্বল ঐতিহ্যবাহী বাঙালি জাতি শাসকের রক্তচক্ষু পরোয়া করেনি। রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছে মাতৃভাষার সম্মান। আর এই দীর্ঘ প্রেক্ষাপট বাঙালিকে যেভাবে সম্মানিত করেছে এরই বহিঃপ্রকাশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত এদেশের দীর্ঘ রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে চর্চা হয়েছে বাংলা ভাষার মূল যেভাবে প্রথিত হয়েছে চেতনার গভীরে তাতে এর যে-কোনো লাঞ্ছনা যে বাঙালি গ্রহণ করবে না তা সতর্ক মানুষ মাত্রেরই অনুভব করার কথা। কিন্তু নবসৃষ্ট পাকিস্তান নামের দেশটির অবাঙালি শাসক তা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারা দেশটির জন্মলগ্নেই ভাষা প্রশ্নে সৃষ্টি করলেন সংকট। তারাই বাঙালির ভাষা বাংলাকে কেড়ে নিয়ে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলেন। আর এর প্রেক্ষাপটে ভাষার দাবিতে আন্দোলনে সক্রিয় হওয়া বাঙালির জন্য ছিল অবধারিত।

একুশেই আমাদের জাতিসত্তার শুরু। পাকিস্তান নামক অবাস্তব রাষ্ট্রটির শুরুতেই একুশের ভাবনা শুরু যখন জিন্নাহ এবং এর পরবর্তীকালে খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন 'উর্দু, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। স্বভাবতই অফিস আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিক্ষার মাধ্যম– সবক্ষেত্রেই রাষ্ট্রভাষার প্রাধান্য থাকবে। রাষ্ট্রভাষার বাইরে মাতৃভাষার চর্চা হয়ে যায় সংকুচিত। ভাষার অপব্যবহার মানে ভাষার মৃত্যু। বাঙালিরা তখনই বুঝেছিল যে মাতৃভাষার বঞ্চনা মানে জাতীয় বঞ্চনা, মাতৃভূমির বঞ্চনা। বাঙালিদের দমিয়ে রাখার এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। বাঙালিরা এ সত্য দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিল বলে পাকিস্তানি শাসকবর্গের ঘোষণায় প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। ১৯৪৮ থেকে জোর প্রতিবাদ শুরু, সর্বস্তরের জনতা হয় প্রতিবাদমুখর– রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। বলাবাহুল্য ছাত্র সমাজই এ প্রতিবাদের পুরোধা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ পরিণত হয় রণাঙ্গনে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে রফিক, সালাম, বরকতের মতো অনেক তরুণ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা তৎকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙালি জাতির সর্বপ্রথম অধিকার সচেতন এবং সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্রে

দীক্ষিত হয়ে উঠে। পূর্ব বাংলার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিতে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। এ আন্দোলন পূর্ব বাংলায় ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। পরবর্তীতে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্র সমাজই মুখ্যচালকের ভূমিকা পালন করেছে আর তাদের প্রেরণার মূল উৎস ছিল একুশের চেতনা।

আন্দোলনের মিছিলে নারীদের অংশগ্রহণ

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা

বাংলা ভাষার ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং এদেশের মানুষের মুক্তির চিন্তায় বাংলা ভাষাভিত্তিক চেতনার অবদান সীমাহীন। বাঙালির নিজের মায়ের ভাষার অধিকার আদায়ের লড়াই ছিল এদেশের মানুষের মুক্তিরই প্রতিচ্ছবি। ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কার্জন হলে অনুষ্ঠিত প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এক ঐতিহাসিক উচ্চারণের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্‌বোধন করা হয় বলা চলে। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনো আশ্চর্যের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। যা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারা ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছিলেন যে, মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকবার জো নেই।' কথাটা সমাজবিজ্ঞান সম্মত সত্য যে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন মেটায় রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা হিসেবে, যেমন ব্যক্তি জীবনে তেমনি সমাজ জীবনে। বাদ পড়ে না সংস্কৃতি চর্চা। তাই মাতৃভাষাকে ঘিরে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের যে শিকড়-ঘেঁষা সম্পর্ক তাতে আবেগের উপস্থিতিও যথেষ্ট। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার এক অনিবার্য ঘটনা। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের-ভুবন পাকিস্তানে এই সমাজতান্ত্রিক সত্যগুলো বাস্তবে রূপ নিয়ে দেখা দেয়নি ১৯৪৭-উত্তর সময়ে মুসলিম লীগ কেন্দ্রিক শাসকগোষ্ঠীর কল্যাণে। অবাঙালি শাসকগণ তাই চেয়েছে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে, বাংলাকে একপাশে সরিয়ে রেখে। কার্যত বাঙালিকে পাকিস্তানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। এ অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রথমে রুখে দাঁড়ায় পূর্ববঙ্গের মাতৃভাষাপ্রেমী ছাত্রসমাজ; ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদের প্রকাশ যেমন ১৯৪৮-এর মার্চে, তেমনি ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারিতে ব্যাপকভিত্তিতে তাদের আন্দোলনে সমর্থন জানায় শুরুতে কিছুসংখ্যক শিক্ষিত নাগরিক পরে নানা শ্রেণির মানুষ। ছাত্র আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয় অংশত ১৯৪৮ সালে, পুরোপুরি ১৯৫২ সালে।

একুশের ভাষা আন্দোলন পরিবর্তন ঘটায় বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির চরিত্রে। গণতান্ত্রিক প্রগতিচেতনার প্রকাশ, সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় একুশের চেতনার দারুণ প্রভাব পড়ে। এর সামাজিক প্রভাবে ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুসলিম লীগের ভরাডুবি। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ২১ দফা হয়ে ওঠে বাঙালি জনগণের মুক্তির সনদ। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনে সরকারি দল মুসলিম লীগের পরাজয়ের মাধ্যমে সেই যে দলটির পতন ঘটল এরপর আর কখনো পূর্ববাংলা/পূর্ব পাকিস্তানে তা শক্তিশালী হতে পারেনি। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে পূর্ব বাংলা প্রদেশে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আসে। কিন্তু মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে যুক্তফ্রন্ট বেশিদিন টিকেনি। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সময়কালে মাত্র চার বছরে সাতটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে ও তিনবার গভর্নরের শাসন জারি হয়। ফলে বহু প্রত্যাশিত ২১ দফার দাবিগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে কেন্দ্রে প্রথম গণপরিষদ ভেঙে দিয়ে দ্বিতীয় গণপরিষিদ গঠিত হলে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত এম.পি-গণ পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। বঙ্গবন্ধুও পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে গণপরিষদে বাঙালির দাবি দাওয়া পেশ করার সুযোগ লাভ করেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রে ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। ফিরোজ খান নুনের নতুন দল রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন করে কেন্দ্রে সরকার গঠনের সুযোগ লাভ করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পূর্ব বাংলাতেও আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার সুযোগ লাভ করে। আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করে আওয়ামী লীগ ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে ৩১শে মার্চ ১৯৫৮, ১লা এপ্রিল ১৯৫৮ থেকে ১৯শে জুন ১৯৫৮ এবং ২৫শে আগস্ট ১৯৫৮ থেকে ৭ই অক্টোবর ১৯৫৮ পর্যন্ত মেয়াদে পূর্ব বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলনে তথা ভাষা আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল– স্বতঃস্ফূর্ততা। আন্দোলনের প্রধান কারিগর ছাত্রসমাজের এই কাজে অনমনীয় দৃঢ় প্রত্যয় এক কথায় আপোশহীন প্রতিবাদী চেতনা যা আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে সাহায্য করে। আগুনের মতো আন্দোলন ছড়িয়ে যায় প্রদেশের সর্বত্র জেলাশহর থেকে মহকুমা শহর হয়ে গ্রামের স্কুল পর্যন্ত, বিশেষ করে বাহান্নতে। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে এ আন্দোলন বিস্ফোরিত অর্জন করে ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের সাহসিকতায় আর একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে রফিক, জব্বার, বরকত প্রমুখের মৃত্যুর কারণে আন্দোলনের বিস্তার ঘটে দেশের সর্বত্র এবং সমাজের নানা স্তরে।

ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার মর্যাদার জন্যই গড়ে ওঠেনি। এর সঙ্গে জীবিকা অর্জনের প্রশ্নও জড়িত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি অমান্য করে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী, প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু স্থাপিত হয়। শাসকদের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বেছে নেওয়ায় বাঙালিদের চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজনীতিসহ সর্বত্র বাঙালিকে বঞ্চিত করার পশ্চিমা মানসিকতা। তাই ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও দ্বিজাতি-তত্ত্বভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে তারা বেছে নেয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন-বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

ভাষা আন্দোলন ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ক্রমে এর সঙ্গে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলন ও পরে বিভিন্ন লেখনী ও দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বাংলা ভাষা নয় বরং বাঙালিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপিত হয়। গণপরিষদে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়। যুক্তফ্রন্ট এসব দাবিতে প্রথম জনসম্মুখে নিয়ে আসে। যা ষাটের দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবিতে পরিস্ফুটিত হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে যা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। তাই বলা যায় যে, ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা জুগিয়েছে ভাষা আন্দোলন।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলাদেশের প্রথম গণচেতনার সুসংগঠিত সফল গণ-অভ্যুত্থান। এই আন্দোলন থেকে পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতি নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়। পাকিস্তানের প্রতি মোহ এবং রাজনীতিতে ধর্মীয় আচ্ছন্নতা দ্রুত গতিতে কেটে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসনের দাবি দানা বাধতে শুরু করে। ভাষা আন্দোলনের পর ঢাকাসহ দেশব্যাপী শহিদমিনার নির্মিত হয়, যা পরবর্তী কালে হয়ে ওঠে বাঙালি জাতির প্রতিবাদের ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক। একুশে ফেব্রুয়ারি 'শহিদ দিবস' প্রতিবাদী চেতনার প্রতিফলন, যা পাকিস্তান আমলে জাতীয় সংগ্রামের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এখনো শহিদ দিবস পালনে সেই চেতনার প্রকাশ যা একুশের চেতনা হিসেবে পরিচিত। ভাষা আন্দোলনকে আমরা প্রায়ই খুব সীমিত এবং খণ্ডিত পরিসরে উপস্থাপন করি। আমরা বলে থাকি, ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষারই আন্দোলন ছিল। কিন্তু না, আন্দোলনটি ছিল আরও ব্যাপক ও গভীর। ভাষা আন্দোলনের মূল প্রণোদনা হলো একুশ মানেই মাথা নত না করা। ভাষা আন্দোলন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও কালক্রমে তা রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং বাঙালিকে অধিকার সচেতন করে তোলে। ভাষা আন্দোলন থেকে পাকিস্তানের ধ্বংসের সূত্রপাত হয় এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু শোক দিবস নয়, একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদী দিবস, মাতৃভাষা দিবসও বটে। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যা প্রতিবছরে দেশে দেশে পালিত হয়। বাংলাদেশের এই ঘটনা নিঃসন্দেহে অহংকারের। এভাবেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, বিশেষত একুশের আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে বহুমাত্রিক গুরুত্ব বহন করে চলেছে এর সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আতিউর রহমান সম্পাদিত, *ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, ঢাকা, ইউপিএল, ২০০০

২. এম আব্দুল আলীম, *ভাষা- আন্দোলন-কোষ*, ঢাকা, কথা প্রকাশ, ২০২০

৩. শামসুল বারী, রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইস্তেহার- ঐতিহাসিক দলিল, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, ২০০২

৪. এম আব্দুল আলীম, *ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব-তারিখ ও ঘটনাপঞ্জি*, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, ২০১৯

৫. বশির আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০৩

৬. মোস্তফা কামাল সম্পাদিত, *ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ১৯৯৭

৭. মাযাহারুল ইসলাম, *ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী,২০১৭

৮. শেখ হাসিনা সম্পাদিত, *সিকরেট ডকুমেন্টস অফ ইন্টেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ অন ফাদার অফ দ্যা নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা, হাক্কানী পাবলশার্স, ২০১৮

৯. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০০৪

১০. *তাজউদ্দীন আহমেদের ডায়েরী ১৯৪৭-৪৮, প্রথম খণ্ড*, ঢাকা, প্রতিভাস ২০১৮

১১. নঈমউদ্দীন আহমদ, *বাংলা ভাষার আন্দোলন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১৭

১২. বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা, সুবর্ণ, ২০১৭

১৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা, ইউপিএল, ২০১৯

১৪. রফিকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান' (১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্র)

১৫. এস এম জাকির হোসাইন, *আন্দোলন সংগ্রামে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ*, ঢাকা, অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৭

১৬. রতন লাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* (১৯৪৭-৭১), ঢাকা, দি ইউনিভার্সলে একাডেমি, ২০১৫

১৭. আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১

১৮. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০০

১৯. এম. এম. আকাশ, *ভাষা আন্দোলন শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯০

২০. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩

২১. দিলারা আফরোজ খান রূপা সম্পাদিত, *বিশ্বজুড়ে মাতৃভাষা*, ঢাকা, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ২০১৭

২২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *অংশুমান বাংলাদেশ*, ঢাকা, একুশে বাংলা প্রকাশন, ২০১৪

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩: প্রভাতফেরিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু

বীরেন মুখার্জী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ লুক্কায়িত বাঙালির ভাষা আন্দোলনের মধ্যে। ভাষা আন্দোলনে বিজয় বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর এই অর্জনের অগ্রভাগে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে সত্তরের দশকে বাঙালি জাতিসত্তার ক্রমোত্তরণে, প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে এবং পরিণামে একটি মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাঙালির নিজস্ব রাষ্ট্রনির্মাণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন ইতিহাসের পুরোধা পুরুষ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন। জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন নিজের জীবন।

বাংলা ভাষার আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই। কিন্তু ভারত ভাগের আগে বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। লেখক, গবেষক, ভাষাসৈনিক ও জাতীয় অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মতে, 'দেশভাগের পূর্বে গণ আজাদী লীগ এবং দেশভাগের পর গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন।' (সূত্র: এম আর মাহবুব, *রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*)। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, '১৯৫২ সালের একুশের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু জেলে বন্দি থাকলেও নানাভাবে আন্দোলনের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।' ১৯৪৭ সালে 'গণ আজাদী লীগ' গঠিত হলে এ সংগঠনই প্রথম বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিল। গবেষক বশীর আল্‌হেলাল-এর তথ্য মতে, 'ভাষা আন্দোলনে প্রথম সাংগঠনিক রূপ দিয়েছিল তমদ্দুন মজলিস।' (সূত্র: এম আর মাহবুব, *রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*)। বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনীকার অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান এই মজলিসকে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বহুকাজে সাহায্য ও সমর্থন করেন।' ভাষা আন্দোলনের সূচনা, বিকাশ এবং বিস্তার পর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তেও উল্লেখ করেছেন। পাক গণপরিষদে বাংলাকে পরিষদের ভাষা করার দাবি করা হলেও তা করা হয়নি। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে তমদ্দুন মজলিস ও মুসলিম ছাত্রলীগের যৌথ সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। এই সংগ্রাম পরিষদ গঠনেও শেখ মুজিব বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। সার্বিকভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সংশ্লিষ্টতা তিন পর্বে আলোচনা করা যেতে পারে:

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা, বিকাশ ও প্রস্তুতিপর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। এ সময় নবগঠিত দুটি প্রদেশের মধ্যে পূর্ব বাংলার প্রতি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ভাষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে সমবেত হয়েছিলেন কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী। সেখানে পাকিস্তানে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর একই বছরের ৬ ও ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। ওই সম্মেলনে ভাষা বিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে গাজীউল হক বলেন, 'সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান।' ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লিখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।' (সূত্র: গাজীউল হক, 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা', *ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪)। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বাংলা ভাষার দাবির পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলাকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্বদান করেন। (সূত্র: এম আর মাহবুব, *রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*)।

ভাষা আন্দোলনের এ পর্যায়ে ইশতাহার প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ জন ভাষাবীর সর্বপ্রথম ২১ দফা দাবি সংবলিত ইশতাহার প্রণয়ন করেন। ওই ইশতাহারে দ্বিতীয় দাবিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত। *রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইস্তেহার-ঐতিহাসিক দলিল* নামের পুস্তিকাটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এ ইশতাহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল এবং তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের মতে, 'পাকিস্তান সৃষ্টির তিন-চার মাসের মধ্যেই পুস্তিকাটির প্রকাশনা ও প্রচার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের জন্য পাকিস্তান

নামের স্বপ্ন সম্পৃক্ত মোহভঙ্গের সূচনার প্রমাণ বহন করে। পুস্তিকাটি যাদের নামে প্রচারিত হয়েছিল, তারা সবাই অতীতে ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। উল্লেখ্য, এদেরই একজন ছিলেন ফরিদপুরের (বর্তমানে গোপালগঞ্জ) শেখ মুজিবুর রহমান; পরবর্তীকালে যিনি বঙ্গবন্ধু হিসেবে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (বিস্তারিত: শায়খুল বারী, *রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইস্তেহার ঐতিহাসিক দলিল*, পুনঃপ্রকাশ জানুয়ারি ২০০২)।

ভাষা আন্দোলন গবেষক এম আর মাহবুব তাঁর *রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, '১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ দেশে প্রথম সফল হরতাল। এ হরতালে শেখ সাহেব নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেপ্তার হন।' ভাষাসৈনিক অলি আহাদ তাঁর *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫* গ্রন্থে লিখেছেন, 'আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ হতে ১০ই মার্চ ঢাকায় আসেন।' ১১ই মার্চের হরতাল কর্মসূচিতে যুবক শেখ মুজিব এতটাই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে এ হরতাল ও কর্মসূচি তাঁর জীবনের গতিধারা নতুনভাবে প্রবাহিত করে। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি* শীর্ষক গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই তার প্রথম গ্রেপ্তার'।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ পর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ পর্বে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে ছিলেন। জেলে থাকলেও বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নেন রাষ্ট্রভাষার ওপর এবং দেশের ওপর পাকিস্তান যে আঘাত করেছে তা ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মোকাবিলা করতে হবে। তিনি কয়েকজনের সঙ্গে মিলে ১৬ই ফেব্রুয়ারি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করেন। যে কারণে বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ভাষাসৈনিক ও সাংবাদিক কে. জি. মুস্তফার উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, 'আন্দোলনে শরিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) ও মহিউদ্দীন এই সময়ে ছাত্র-জনতার সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। এ পর্যায়ে অনশনকারী হিসেবে তাঁকে এবং মহিউদ্দীন আহমদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সিকিউরিটি ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালে ছাত্রদের সঙ্গে শেখ মুজিবের যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পায়।' ভাষাসৈনিক গাজীউল হক 'আমার দেখা আমার লেখা' স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, '১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই '৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে জেলে থেকেই তিনি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।' [পৃ. ৪০]। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যারা গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে ছিলেন যেমন– আব্দুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, কামরুজ্জামান, আব্দুল মমিন তারাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে এবং পরে হাসপাতালে থাকাকালীন আন্দোলন সম্পর্কে চিরকুটের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠাতেন। ভাষাসৈনিক, প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 'একুশকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা' প্রবন্ধে বলেছেন: 'শেখ মুজিব ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ ফরিদপুর জেলে যাওয়ার আগে ও পরে ছাত্রলীগের একাধিক নেতার কাছে চিরকুট পাঠিয়েছেন।' (তথ্যসূত্র: *ভালোবাসি মাতৃভাষা*, পৃ. ৬২)। এতে স্পষ্ট হয় যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি বদ্ধপরিকর ও আপোশহীন ছিলেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সফলতার পর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান:

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিবৃতিও দেন। শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর এ মত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তার সমর্থন আদায় করেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'সে সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা বেশ অসুবিধায় পড়ি। তাই ঐ বছর জুন মাসে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য করাচি যাই এবং তাঁর কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার দাবির সমর্থনে তাঁকে একটি বিবৃতি দিতে বলি।' (তথ্যসূত্র: বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.৩৯৬)। বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষার প্রতি গভীর দরদ অসীম রাজনৈতিক প্রত্যয়ের ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে সমর্থন করে বিবৃতি দেন। বিবৃতিটি ১৯৫২ সালের ২৯শে জুন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ সালে মহান একুশের রক্তাক্ত ঘটনার পর ১৯৫৩ সাল থেকেই শুরু হয় ভাষা আন্দোলন-উত্তর গঠনমূলক ও সফলতার পর্ব। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে রয়েছে, শহিদ দিবস পালন, শহিদমিনার নির্মাণ, যুক্তফ্রন্ট গঠন, আইনসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাকিস্তানের সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ও সর্বস্তরে চালু করার প্রচেষ্টা, বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য তুলে ধরা ইত্যাদি। এর প্রতিটি স্তরেই বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমিতে একটি সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, 'ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু হবে।' (সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। এটাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষায় প্রণীত সংবিধান।

বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। আর বাঙালির সকল আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্থপতির ভূমিকা পালন করে আমাদের একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু দূরদর্শী নেতা ছিলেন বলেই বাঙালির সকল অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গণমাধ্যমকর্মী

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯ প্রদান উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গণভবন থেকে ১৭ই জানুয়ারি ২০২১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি প্রত্যক্ষ করেন–পিআইডি

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯

সুস্মিতা চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই জানুয়ারি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৭ই জানুয়ারি ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯-এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তারিক আনাম খানের হাতে সম্মাননা তুলে দেন–পিআইডি

সকাল সাড়ে ১০টায় ৬টি যুগ্মসহ ২৬টি ক্যাটাগরিতে শিল্পী ও

শ্রেষ্ঠ পুরস্কার	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র
আজীবন সম্মাননা পুরস্কার (যুগ্ম)	অভিনেতা মাসুদ পারভেজ ও অভিনেত্রী কোহিনুর আক্তার সুচন্দা	
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজক (যুগ্ম)	ফরিদুর রেজা সাগর মাহবুব উর রহমান	ফাগুন হাওয়ায় ন'ডরাই
শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট	নারী জীবন
শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ টেলিভিশন	যা ছিলো অন্ধকারে
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক	তানিম রহমান অংশু	ন'ডরাই
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে	তারিক আনাম খান (তারিকুল আনাম খান)	আবার বসন্ত
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে	সুনেরাহ বিনতে কামাল	ন'ডরাই
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে	এম ফজলুর রহমান বাবু	ফাগুন হাওয়ায়
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে	নার্গিস আকতার (হোসনেয়ারা)	মায়া: দ্য লস্ট মাদার
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খল চরিত্রে	জাহিদ হাসান	সাপলুডু
শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী (যুগ্ম)	নাইমুর রহমান আপন আফরিন আক্তার	কালো মেঘের ভেলা যদি একদিন
শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক	মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ইমন	মায়া: দ্য লস্ট মাদার
শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক	হাবিবুর রহমান	মনের মতো মানুষ পাইলাম না
শ্রেষ্ঠ গায়ক	মৃণাল কান্তি দাস	শাটল ট্রেন
শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যুগ্ম)	মমতাজ বেগম ফাতিমা-তুয-যাহুরা ঐশি	মায়া: দ্য লস্ট মাদার মায়া: দ্য লস্ট মাদার
শ্রেষ্ঠ গীতিকার (যুগ্ম)	নির্মলেন্দু গুণ কামাল চৌধুরী	কালো মেঘের ভেলা মায়া: দ্য লস্ট মাদার
শ্রেষ্ঠ সুরকার (যুগ্ম)	প্লাবন কোরেশী (আব্দুল কাদির) সৈয়দ মো. তানভীর তারেক	মায়া: দ্য লস্ট মাদার মায়া: দ্য লস্ট মাদার
শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার	মাসুদ পথিক (মাসুদ রানা)	মায়া: দ্য লস্ট মাদার
শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার	মাহবুব উর রহমান	ন'ডরাই
শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা	জাকির হোসেন রাজু	মনের মতো মানুষ পাইলাম না
শ্রেষ্ঠ সম্পাদক	জুনায়েদ আহমদ হালিম	মায়া: দ্য লস্ট মাদার
শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশক (যুগ্ম)	মোহাম্মদ রহমত উল্লা বাসু মো. ফরিদ আহমেদ	মনের মতো মানুষ পাইলাম না মনের মতো মানুষ পাইলাম না
শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক	সুমন কুমার সরকার	ন'ডরাই
শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক	রিপন নাথ	ন'ডরাই
শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা	খোন্দকার সাজিয়া আফরিন	ফাগুন হাওয়ায়
শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান	মো. রাজু	মায়া: দ্য লস্ট মাদার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৭ই জানুয়ারি ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯-এ শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক হারুন উর রশিদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন–পিআইডি

কলাকুশলীর মধ্যে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি গণভবন থেকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৭ই জানুয়ারি ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯-এ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামালের হাতে সম্মাননা তুলে দেন–পিআইডি

পুরস্কার জয়ী শিল্পী ও কলাকুশলীদের হাতে পুরস্কারের স্মারক, সম্মানী ও সনদপত্র তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্যসচিব খাজা মিয়া।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমারো একটা দুঃখ থেকে গেল, করোনার জন্য সরাসরি এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলাম না। তারপরও যারা পুরস্কার পেলেন তাদেরকে অভিনন্দন। এদেশের সিনেমার জন্য আমরা অনেক কাজ করেছি। আমাদের পরিবারের সদস্যরা শিল্প-সাহিত্য ভালোবাসেন। শেখ কামালের কথা তো সবার জানা। শেখ কামাল খেলার বাইরে নাটকের সঙ্গে জড়িত ছিল। এই শিল্পের মানুষদের কাছ থেকে অনেক আগে থেকেই দেখেছি। তাই তাদের জন্য ভালো কিছু করার ইচ্ছে অনেক দিনের, সেভাবেই কাজ করছি।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা বেশি বেশি নির্মাণ হওয়া দরকার। তাহলে নতুন প্রজন্ম অনেক কিছু জানতে পারবে। একটি সিনেমা, নাটক, গান বা কবিতার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু জানা যায়। গভীরে প্রবেশ করা যায়। চলচ্চিত্র শিল্প ধ্বংস হয়ে যাক তা আমরা চাই না। আমরা চাই, আমাদের সিনেমা আগের সুনাম ফিরিয়ে আনুক। শিশুদের জন্য সিনেমা নির্মাণ হওয়ার প্রয়োজন।

দেশীয় চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য যৌথভাবে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে চলচ্চিত্র অভিনেতা মাসুদ পারভেজ ও অভিনেত্রী কোহিনুর আক্তার সুচন্দাকে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে সিনেমা হলের জন্য হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিলের ঘোষণা দেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ঢাকাই ছবির গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, চলচ্চিত্র জীবনের কথা বলে, সমাজের কথা বলে, দেশের কথা বলে। চলচ্চিত্র শিল্পের কথা ভেবে বঙ্গবন্ধু এদেশে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন' (বিএফডিসি) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, 'চলচ্চিত্রের স্বর্ণালি দিন ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এক হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন করা হচ্ছে। যেখান থেকে এই শিল্পের মানুষ উপকৃত হবেন। শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টও হয়েছে। আরও অনেক কাজ হয়েছে এই শিল্পের জন্য এবং হওয়ার পথে। এ তহবিল থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে যেসব সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলো চালু করা যাবে। বর্তমানে যেসব সিনেমা হল চালু আছে সেগুলোকেও আধুনিকায়ন করা যাবে এবং উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে নতুন নতুন সিনেমা হল গড়ে তোলা যাবে। খুব সহসাই এ তহবিল চালু হতে যাচ্ছে ও তহবিল চালু হওয়ার পর চলচ্চিত্রশিল্প একটি নতুন মাত্রায় উন্নীত হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতি জেলায় একটি করে তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণের যে প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে, সেটির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ২৮টি জেলায় তথ্যকেন্দ্র ও সিনেপ্লেক্স নির্মাণ হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

ভাষা আন্দোলন

শাহনাজ পারভীন

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ১৯৫২ ভাষা আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তান শাসক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সূচিত হয় ভাষা আন্দোলন। দেশীয় সাংস্কৃতিকে বেগবান করার লক্ষ্যে এ সময়ই গঠিত হয় তমদ্দুন মজলিস নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তৎকালীন সময়ে করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারিতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনের ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করা হলে লিয়াকত আলী খান এবং নাজিমুদ্দীন প্রমুখ মুসলিম লীগের নেতারা বিরোধিতা করেন। ছাত্রজনতা বাংলা ভাষাকে অন্যতম ভাষা করার দাবিতে তাঁরা সংগঠিত হতে থাকল। ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নামে এক সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে অথচ পাকিস্তান সরকার সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১১ই মার্চ সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের মনে স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। পাকিস্তান শাসক খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন কোনো জাতির রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সমূলে ধ্বংস করতে হলে সর্বাগ্রে সেই জাতির ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে হবে। তাই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে।

১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিবাদ, দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

পাকিস্তানে ১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৯জন সচিবের মধ্যে সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো তা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তখন তেমন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। নদীতে বাঁধ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলেও পূর্ব পাকিস্তান ছিল বঞ্চিত।

সেসময় পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ৫১ মার্কিন ডলার আর পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৪৬ ডলার। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ১৯৫০ থেকে ৫৫ সালের মধ্যে মোট উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে আর শতকরা ২০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীতে যোগদানকারী পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১০ ভাগ। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পিছিয়ে ছিল। সিংহভাগ বরাদ্দ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হতো এবং পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হতো নামমাত্র একটি অংশ। বাঙালিদের মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা আন্দোলন শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা পরিণত হয়েছিল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে। দেশের জনগণের সমর্থনও ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ছয় দফার মাঝেই নিহত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ।

১৯৬৯ সালে ধারাবাহিক নানা ঘটনাবলি চলমান আন্দোলনকে দুর্বার ও মারমুখী করে তোলে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সব নেতাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। ছাত্রজনতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১০ নেতাকে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক গণসংবর্ধনা দেয়। ঐ দিনই ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ ছাত্র জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেন।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ছিল এদেশের জনগণের স্বাধিকার আদায় ও মুক্তি লাভের প্রতীক। পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শে ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সরকার গঠনসহ ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। ১৯৭১-এর ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ঝড় ওঠে। সর্বস্তরের জনগণের রাজপথে নেমে আসে। তারপর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন। চারদিকে আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বাঙালিদের আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা শহরসহ অন্যান্য শহরে নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ দিনই মধ্যরাতে বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেই ঘোষণাই ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক সব শ্রেণির মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং এর ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্ম হয়।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

রহনপুরের খুন্তে বক

প্রফেসর ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

ভাগ্নে তানভীরকে নিয়ে ভোর ছ'টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ বিশ্বরোডে নেমে এক ঘণ্টা বিশ মিনিটে রহনপুর চলে এলাম। রহনপুর রেল স্টেশনে আমাদের জন্য সুজনের অপেক্ষা করার কথা। অথচ ওর ফোন বন্ধ। বাস স্টেশন থেকে হাঁটতে হাঁটতে রেল স্টেশনে গেলাম। বিশাল আমের বাজার এখানে। সুজনের ফোনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বিভিন্ন জাতের আমের ছবি তুলতে লাগলাম। আম ব্যবসায়ী বাইরুল ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। উনার আতিথেয়তায় মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। নানা জাতের আমে সকালের নাস্তা করিয়ে উনি আমাদেরকে দুজন লোক দিয়ে যেই না চরইল বিলে পাঠানোর উদ্যোগ নিলেন আর অমনি সুজনের ফোন বেজে উঠল। বাইরুল ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুজনের সঙ্গে বিলের পথে পা বাড়ালাম।

অরুণের নৌকা ঘাটেই বাঁধা ছিল। আমাদের নিয়ে সে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মাঝারি পানকৌড়ির ছবি দিয়ে ক্যামেরা ক্লিক করা শুরু হলো। ওদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে দ্রুত ভারতীয় সীমান্তের কাছে ধানক্ষেতের দিকে ধাবিত হলাম। পথিমধ্যে বাবুই, ধানটুনি, বিভিন্ন প্রজাতির বক, সাপ ও পাখির সঙ্গে দেখা হলো। কিছুটা অনাগ্রহের সঙ্গে ওদের ছবি তুললাম। অরুণ মাঝিকে দ্রুত স্পটে নিতে বললাম। স্পটে এসেই দেখা হয়ে গেল চার চারটি সোনাজঙ্ঘার সঙ্গে। কিন্তু চামচ ঠোঁটের সেই পাখিটিকে তো দেখছি না। অবশ্য বেশ কিছু বকও দেখা যাচ্ছে। এমন সময় একটা ধূর্ত শিয়ালকে চুপি চুপি পাখিগুলোর পিছু নিতে দেখলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই বকের ঝাঁক থেকে চামচের মতো চঞ্চুটি বের করে আকাশের দিকে তাকাল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই পাখিটি। মনের মতো করে ক্যামেরার ক্যানভাসে ওর ছবি আঁকলাম।

অতি আরাধ্য চামচের মতো চঞ্চুযুক্ত পাখিটি এদেশের বিরল পরিযায়ী পাখি খুন্তে বক। কোদালি বা চামচঠুঁটি বক নামেও পরিচিত। ইংরেজি নাম Eurasian Spoonbill বা Common Spoonbill। বৈজ্ঞানিক নাম *Platalea leucorodia (প্লাটালিয়া লিউকোরডিয়া)*। আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে পাখিটির বৈশ্বিক বিস্তৃতি রয়েছে। বিরল ও মহাবিপন্ন পাখিটিকে ইতঃপূর্বে এদেশের উপকূলীয় এলাকা ও রাজশাহীর পদ্মায় শীতকালে দেখা গেলেও রহনপুরে বর্ষাতেও বিচরণ করতে দেখা গেছে। কাজেই এটা অত্যন্ত আশাপ্রদ সংবাদ আমাদের জন্য। কে জানে ভবিষ্যতে হয়ত ওর বাসাও খুঁজে পাব এদেশে। তখন এটি পরিযায়ী পাখি থাকবে না, হয়ে যাবে আমাদের আবাসিক পাখি।

খুন্তে বক এক নজরে চঞ্চুযুক্ত বড়ো বকজাতীয় পাখি। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির ঠোঁটের আগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৭০-৯৫ সেন্টিমিটার। প্রসারিত অবস্থায় ডানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লম্বায় ১১৫-১৩৫ সেন্টিমিটার। ওজন ১.১৩-১.৯৬ কেজি। দেহের রং সাদা। ঠোঁট লম্বা, সোজা ও এর প্রান্ত চামচের মতো ছড়ানো। ঠোঁটের রং কালো ও ওপরের ঠোঁটের অগ্রভাগ হলুদ। গলার নিচের পালকহীন অংশের চামড়ার রং হলদে। চোখ কালচে-বাদামি থেকে বাদামি-লাল। লম্বা পা ও আঙুল কালো। স্ত্রী-পুরুষ দেখতে একই রকম। প্রজননকালে প্রাপ্তবয়স্ক পাখির মাথায় সরু ও লম্বা পালকের ঝুলন্ত ঝুঁটি দেখা যায়। ডানার প্রান্ত-পালকের আগা হয় কালো। বুকে কমলা রঙের আভা দেখা যায়। গলার নিচের পালকহীন অংশের চামড়ার রং হয় গাঢ় কমলা-হলুদ। অপ্রাপ্তবয়স্ক পাখি দেখতে প্রজননহীন পাখির মতো; তবে এদের ডানার প্রান্ত-পালকের অগ্রভাগের কালো রং বেশ বিস্তৃত। ঠোঁট ও পা গোলাপি।

খুন্তে বক নদী, বড়ো হ্রদ, জলাভূমি, গরান বন, জোয়ারভাটার খাড়ি ইত্যাদিতে বাস করে। সচরাচর বিভিন্ন প্রজাতির বক, কাস্তেচরা, সারস প্রভৃতির সঙ্গে একই ঝাঁকে বিচরণ করে। এরা দিবাচর হলেও ভোরবেলা ও গোধূলিতে বেশি সক্রিয় থাকে। অল্প পানিতে ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে ও ঠোঁট পানিতে ডুবিয়ে চিংড়ি, শামুক, ছোটো মাছ, ব্যাঙাচি, জলজ কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে খায়। গলা ও পা প্রসারিত করে উড়ে। এরা সচরাচর ডাকে না, নীরব থাকে।

খুন্তে বক জুলাই থেকে জানুয়ারিতে প্রজনন করে। এসময় মূল আবাস এলাকায় কোনো দ্বীপের ভূমিতে অথবা পানিতে দাঁড়ানো গাছের ডাল, নলখাগড়া বা ঝোপে ভূমি বা পানির পৃষ্ঠতল থেকে ৫ মিটার উচ্চতায় ডালপালা, কাঠি কুটি, ঘাস ও পাতা দিয়ে বাসা বানায়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলেমিশে বাসা বানায়। বাসা তৈরি হলে স্ত্রী তাতে ৩-৫টি ডিম পাড়ে। ডিমের রং সাদাটে ও তার ওপর গাঢ় রঙের সূক্ষ্ম ছিটছোপ থাকে। স্ত্রী-পুরুষ পাখি পালাক্রমে ডিমে তা দেয় ও ২৪-২৫ দিনে ডিম ফোটে। ছানাদের লালনপালনের দায়িত্ব বাবা-মা মিলেমিশে করে। জন্মের সময় ছানাদের ঠোঁট চামচের মতো থাকে না। প্রায় ৯ দিন বয়সে এটি চ্যাপটা হতে শুরু করে ও চামচের আকার নিতে প্রায় দু'সপ্তাহ সময় লাগে। ছানারা ৪৫-৫০ দিনে উড়তে শিখে। তবে প্রজননক্ষম হতে ৩-৪ বছর সময় লাগে। আয়ুষ্কাল সাত বছরের বেশি।

লেখক: অধ্যাপক ও প্রধান, ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি বিভাগ ও পরিচালক, ভেটেরিনারি টিচিং হসপিটাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর

জ্ঞানজ্যোতি ড. আনিসুজ্জামান স্যারের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি

রহিম আব্দুর রহিম

বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুরোধা, বাঙালির স্বাধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রাণপুরুষ, বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। তিনি বাঙালি জাতিসত্তা, বাঙালির ভাষাজ্ঞান ও ভাষা পরিস্থিতি তুলে এনেছেন লেখার আলোর রেখায়। সর্বদায় তিনি সমসাময়িক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটি বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। ড. আনিসুজ্জামান স্বাধীন বাংলাদেশের ন্যায়বিচার, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে যখন আঘাত এসেছে, তখন তিনি একজন কলমসৈনিক হিসেবে জাতিকে সুপথ দেখিয়েছেন। পাণ্ডিত্য, ভাষাজ্ঞান, সংযমী, তথ্যবিচারে পক্ষপাতহীনতা, অসীম অভিজ্ঞতা, বহুমুখী জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত আনিসুজ্জামান বাঙালির কাছে ছিলেন পরিশীলিত মনীষী। তাঁর চিন্তা-চেতনা, অভিজ্ঞতা, তত্ত্ব ও তথ্যের ভাণ্ডার জ্ঞানপিপাসুদের চিন্তার প্রেরণাশক্তি হিসেবে কাজ করে। যাঁর কলম ও লেখনী ছায়া ফেলেছে শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। নিবেদিতপ্রাণ এই শিক্ষক জাতীয় সংকটকালে প্রচণ্ড সাহস ও গর্বের সঙ্গে লড়াইয়ে যুক্ত ছিলেন। ড. আনিসুজ্জামান জাতির বাতিঘর।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ছাত্র অবস্থায় তিনি যুক্ত হন অসাম্প্রদায়িক সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গে। গবেষক মামুন মুস্তাফা 'আনিসুজ্জামান নির্ভরতার প্রতীক' শিরোনামের এক প্রবন্ধে বলেন, 'সাহিত্য-সংস্কৃতির হাত ধরে, ভাষা আন্দোলন ও ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িত হওয়া– এ যেন ইতিহাসের পথ বেয়ে এগিয়ে চলা।' আনিসুজ্জামানের ভাষায়, 'ইতিহাস আমাকে আনুকূল্য করেছে।' হ্যাঁ, আনুকূল্যই বটে। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এমনকি স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে-কোনো সময়ে বাঙালি জাতিসত্তার সংকটকালে তিনি রাজনৈতিক কর্মীর মতোই লিখেছিলেন সব ইশতাহার, শিক্ষক হয়ে দেখিয়েছেন স্বাধিকার আন্দোলনের উজ্জ্বল পথ। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানেও রয়েছে তাঁর স্পর্শ। সরল, নিরহংকার, উঁচুমনের বিশাল এই মনীষীর বাক্যশৈলী একজন শিশুর কাছেও সহজবোধ্য। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ড. আনিসুজ্জামান শিক্ষক হিসেবে ছিলেন শিক্ষার্থীদের ভরসাস্থল। ছাত্রদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ অনুকরণীয়। যাঁরা এই মহান শিক্ষকের আদর্শ লালন করেছেন, অনুকরণ করতে পেরেছেন– তাঁরা প্রত্যেকেই আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

আদর্শের প্রতিকৃতি ড. আনিসুজ্জামান ২২ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবারো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ভরাট-কণ্ঠের ও সুঠাম দেহের জ্ঞানজ্যোতি, সাদামনের এই শিক্ষক গায়ে পড়তেন ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি, পরনে পায়জামা। তিনি চলতেন মাথা নিচু করে; ছাত্রদের সম্বোধন করতেন বাবা বলে। আমি ১৯৮৮-১৯৮৯ সেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র হওয়ায় এই মহান মানুষটিকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। ছাত্র হিসেবে নয়, একদিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হতে যাই লেখক হিসেবে। তিনি আমার নাম জানতে চান। আমি বললাম– মো. আব্দুর রহিম। লেখকনাম 'রহিম আব্দুর রহিম'। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'নামের মাঝে চালাকি রয়েছে'। সদাহাস্য প্রফুল্লমনের অধিকারী এই মনীষীর কাছে আমি আর কখনো লেখক নই, ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করেছি। তাঁর সততা, নিষ্ঠা, কীর্তি সব কিছুই আমাদের স্মরণীয় এবং অনুকরণীয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখনীর নিয়মিত পাঠক।

১৯৯২ সালে ড. আনিসুজ্জামান তাঁর একটি লেখায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আজ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দেখি, তখন মনে হয়, আমার জীবনসাধনা ব্যর্থ। তেত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করেও আমি কিছু শেখাতে পারিনি।' ড. আনিসুজ্জামান স্যারের আত্মকথার প্রথম পর্ব *কালনিরবধি* প্রকাশ হয় ২০০৩-এ। তার আগে ১৯৯৭ সালে প্রকাশ পায় পাঠক চিত্তজয়ী মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথন *আমার একাত্তর*। তাঁর *বিপুলা পৃথিবী* প্রকাশ হয় ২০১৫-তে। এসব বাংলাসাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রতন।

ড. আনিসুজ্জামান তাঁর কর্মের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করেছেন, তিনি মুক্তবুদ্ধি চেতনার বাঙালি, ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক মহিরুহ। যিনি কখনো মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির সঙ্গে আপোশ করেননি; যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে গণ-আদালতে, একই কায়দায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালেও একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন অকুতোভয়ে। শিক্ষক আনিসুজ্জামান বাঙালি মনীষার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। এই মহান শিক্ষককে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫ সালে 'ডিলিট' উপাধিতে, ভূষিত করেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশি, যিনি ভারতের 'পদ্মভূষণ' উপাধি পেয়েছেন।

মহাপাণ্ডিত্যের অধিকারী, বিনয়ী আনিসুজ্জামান স্যারকে ২০১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বাংলা একাডেমির সাধারণ সভায় শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেয়েছি। ওই দিন তিনি ষাটোর্ধ্ব এক সদস্যের বক্তব্যের সংশোধনী আনতে গিয়ে শিক্ষকসুলভ ভাষায় বলেছিলেন, 'বাংলা একাডেমিতে মহাসচিব থাকেন না, থাকেন মহাপরিচালক বা সভাপতি'। তিনি ১৯৫৮ থেকে শিক্ষকতায় ব্রতী ছিলেন। তিনি 'জাতীয় অধ্যাপক' হিসেবে নিয়োগ পান ২০১৮ সালের ১৯শে

জুনে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও তিনি কলকাতার মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ ক্যারোলাইন স্টেট ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং ফেলো হিসেবেও যুক্ত ছিলেন।

তিনি দেশ ও বিদেশের বিদ্ধৎসমাজ থেকে পেয়েছেন যোগ্যতার স্বীকৃতি। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাংলা একাডেমির সভাপতি পদে থেকে এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবদীপ্ত মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। কর্মদীপ্ত এই মহান ব্যক্তি ড. আনিসুজ্জামান স্যারের সর্বশেষ সান্নিধ্য পেয়েছি ২০২০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি অমর একুশের বইমেলায়। তাঁর সভাপতিত্বে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইমেলার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধন শেষে ৮৩ বছর বয়স্ক চিরতারুণ্যের প্রতীক ড. আনিসুজ্জামান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ড. আনিসুজ্জামান। তাঁর পিতা এ টি এম মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন নামকরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। মাতা সৈয়দা খাতুন। পিতামহ শেখ আব্দুর রহিম লেখালেখি করতেন। ১৫ বছর বয়সেই আনিসুজ্জামান লেখেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর এক পুস্তক। প্রাতিষ্ঠানিক কৃতিত্ব তাঁর অসাধারণ। অনার্স-মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারী। যশস্বী মনীষী আনিসুজ্জামান বাংলা ভাষাভাষী মানুষের শুদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও ঐতিহ্যের পথিকৃৎ।

তিনি সৃজনকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন– বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০), অলক্ত পুরস্কার (১৯৮৩), একুশে পদক (১৯৮৫), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫), নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক (১৯৫৬)। কীর্তিমান এই সাহিত্য সাধককে ২০১৫ সালে স্বাধীনতা পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

বোধের গবেষক, স্বভাবের লেখক, শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামানের *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৪), *মুসলিম বাংলা সাম্প্রদায়িকপত্র* (১৯৬৯), *মুনীর চৌধুরী* (১৯৭৫), *স্বরূপ সন্ধানে* (১৯৭৬), *আঠারো শতকের বাংলা চিঠি* (১৯৮৩), *মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ* (১৯৮৩), *পুরানো বাংলা গদ্য* (১৯৮৪), *মোতাহার চৌধুরী* (১৯৮৮), *আমার একাত্তর* (১৯৯৭), *আমার চোখে* (১৯৯৯) ও *কালনিরবধি* (২০০৩) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

দায় ও দায়িত্বশীল সমাজ অভিভাবক, রাষ্ট্রচিন্তক ড. আনিসুজ্জামানের শিক্ষক ছিলেন মুনীর চৌধুরী ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর সহপাঠী ছিলেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। তাঁর এক সাক্ষাৎকারে ওঠে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মানবব্রতীর এক অজানা চরিত্র। যেখানে বিশ্রামের জন্য সাধারণের সাথে দেখা না করার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'লোককে খেতে দিতে পারি না, পরতে দিতে পারি না, দেখাও যদি দিতে না পারি, তাহলে আমার আর থাকল কী?'

ড. আনিসুজ্জামান স্যারের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন গবেষণা সাহিত্যপত্র 'লেখমালা'র সম্পাদক। ১৯৭২ সালের ড. কুদরত-ই-খুদা জাতীয় শিক্ষা কমিশনের এই সদস্য সাক্ষাৎকারে বলেন–

> বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের আগের দফায় যে শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছিল, তার প্রয়োগ তেমন হয়নি। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছি, সেটাই অনেকখানি ঘষামাজা করে আসছি। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সম্প্রতি যা ঘটল, তাতে মনে হয়, গৃহীত নীতি

> বাস্তবায়নে আমরা উৎসাহী নই। আমার মনে হয় না, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একজন শিক্ষার্থীর সকল সম্ভাবনার বিকাশে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারছে। তবে আমরা যেভাবে বড়ো বড়ো শিক্ষিত মানুষদের জানি, তাদের প্রতিভা বিকাশে শিক্ষাব্যবস্থার কোনো ভূমিকাই ছিল না, একথাও তো সত্য।

তিনি সাক্ষাৎকারে আরো বলেন–

> অনেক দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার পরীক্ষা পদ্ধতির স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তেমনই করেছিলেন। আমাদের দেশে শিক্ষকরা এবং অভিভাবকরা পরীক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সনদ কাজে আসবে, এই বিশ্বাস থেকে আমরা বেশি বেশি পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছি। অভিভাবকরাও চান, ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভালো করুক। কী শিখল তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই।

ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি আরো অভিমত প্রকাশ করেন–

> বুদ্ধিজীবীদের বিচার বিশ্লেষণ, বক্তব্য, দিক নির্দেশনা কখনো কখনো কোনো কোনো দলের পক্ষে যেতেও পারে, তবে তাঁরা যদি রাজনৈতিক দলের কোটরে চলে যান, তাহলে মানুষ তাঁদের বক্তব্য নিরপেক্ষ বলে গ্রহণ করতে পারে না। আমি যদি কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতীও হই, তবে সেই দল ভুল কিছু করলে, আমাকে তা স্পষ্ট করে ভুল বলেই ব্যাখ্যা দিতে হবে। বুদ্ধিজীবীরা অনেক সময়, এই কাজটি করতে পারেন না, কেননা তাঁদের ভয় হয়, তাঁদের সমালোচনা সেই বিরোধী পক্ষের হাত শক্ত করবে। দেশ ও সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে হলে এই ভয় কাটিয়ে ওঠতে হবে।

নির্ভীক, স্পষ্টভাষী, শিক্ষাবিদ, জাতির বিবেক ড. আনিসুজ্জামান স্যার ১৯৩৭ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সেই তিনি যুক্ত হন প্রগতিশীল আন্দোলনে। তিনি জগন্নাথ কলেজের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। ব্যাপৃত ছিলেন শিক্ষকতার মতো মহান পেশায়। গবেষণা ও লেখনীতে অগ্রণী পুরুষ, মহিরুহ আদর্শ এই শিক্ষক ২০২০ সালের ১৪ই মে মৃত্যুবরণ করেন। জাতির দুঃসময়ের আলোকবর্তিকা, মুক্তিকামী মানুষের পাঞ্জেরি, আদর্শের উজ্জ্বল নক্ষত্র আনিসুজ্জামান স্যারের ছাত্র হওয়ায় গর্ববোধ করি। ১৮ই ফেব্রুয়ারি জ্ঞানজ্যোতি জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান স্যারের জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের নিরন্তর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লেখক: শিক্ষক, কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক, গবেষক, নাট্যকার ও শিশু সংগঠক

মেধা বিকাশে গ্রন্থাগার এবং প্রজন্ম

সুমী শারমীন

খুব ছোটোবেলায় মফস্বল শহরে, বাবার হাত ধরে একটা বড়ো দালান ঘরে গিয়েছিলাম। বাবা বলেছিলেন, 'বড়ো হলে বুঝবে, এর চেয়ে আর বড়ো কোনো শান্তির আশ্রয় নেই।' আমি দেখলাম মাথার ওপরে ফ্যান নেই, ইলেকট্রিসিটির আলোও অপ্রতুল, অথচ আব্বা অসম্ভব আনন্দ নিয়ে এই শেলফ, ঐ বই, খাতায় এন্ট্রি করা নিয়ে তুমুল ব্যস্ত। বুঝলাম না এ আবার কেমন শান্তির জায়গা! আমার সৌভাগ্য হয়েছিল দেশের স্বনামধন্য বিদ্যালয়ে পড়ার। সেই সুবাদে ছোটোবেলা থেকেই বাবার শেখানো পথে হাঁটতে গিয়ে উপলব্ধি করলাম– গ্রন্থাগারের অপরিসীম ক্ষমতা। এমনকি আমার মন খারাপ হলেও লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিতাম। ক্ষণিকের জন্য হলেও নিজেকে খুঁজে পেতাম। কী যে শান্তি! পরম মমতায় গ্রন্থাগার আমাকে কখনো হতাশ করেনি। ঠিক একইভাবে দীর্ঘদিন প্রবাসজীবনেও গ্রন্থাগার আমাকে আত্মীয়-পরিজনদের মতো আগলে রেখেছিল।

গ্রন্থাগার হচ্ছে জ্ঞান-সংগ্রহের স্থান, জ্ঞান-সংরক্ষণের স্থান, জ্ঞান-সংগঠনের স্থান, জ্ঞান-অনুসন্ধানের স্থান, জ্ঞান-বিতরণের স্থান, জ্ঞান-বিকাশের স্থান। আমার কাছে মন খারাপ হলে মন ভালো করার স্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিটা বিশাল বড়ো ছিল, যা আমার কান্নাকে ধারণ করে যত্নে লুকিয়ে রাখত। প্রবাসজীবনেও এর অন্যথা হয়নি। প্রবাসজীবনে তখনো ওদের ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠিনি। একটা বই খুঁজে টেবিলের কোণায় বসে খুব কাঁদছিলাম, হঠাৎ একজন অজি (অস্ট্রেলিয়ান) দুই কাপ কফি নিয়ে এসে আমার দুঃখ ভোলাবার চেষ্টা করেছিল। সেই স্মৃতি আমায় আজও আন্দোলিত করে। তখন মনে হয়েছিল– লাইব্রেরি মানবতার আধার।

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সংজ্ঞায়ন করলে বলা যায়, যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ করা হয় তাকেই গ্রন্থাগার বলে। জ্ঞানচর্চার অন্যতম উপকরণ বই, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি সংরক্ষণের কেন্দ্র হচ্ছে গ্রন্থাগার। এজন্য গ্রন্থাগারকে বলা হয়ে থাকে জ্ঞানের ভাণ্ডার। গ্রন্থাগার শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য হিসেবেই বিবেচিত নয়। বিভিন্ন অফিস আদালত, গবেষণা কেন্দ্র, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর, এনজিও, ল' ফার্মসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে গ্রন্থাগার বিবেচিত। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো– তথ্যসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও তথ্য সেবাদানের মাধ্যমে শিক্ষা, গবেষণা ও অন্যান্য মৌল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

মানবসভ্যতায় গ্রন্থাগারের উদ্ভব ঘটেছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই। মানুষ যখন গাছের বাকল কিংবা পাথরে খোদাই করে লিখত, তখন থেকেই মানুষের মধ্যে জ্ঞানকে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই তখন থেকেই গ্রন্থাগারের উদ্ভব। অতীতে রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশাল বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন গ্রন্থাগার হিসেবে পরিচিত আসুরবানিপালের গ্রন্থাগার, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার, পার্গামাম গ্রন্থাগারগুলোর ইতিহাস থেকে আমরা তার নমুনা দেখতে পাই। মধ্যযুগে ইউরোপ যখন বিদ্যালয় কাকে বলে জানত না, তখন স্পেনের মুসলিমরা জ্ঞানচর্চার জন্যে যে অসংখ্য বই ব্যবহার করত– তার নামের তালিকাটাই ছিল ৪৪ খণ্ডে বিভক্ত। স্পেনের তৎকালীন কার্ডোভা লাইব্রেরিতে ধর্মীয় গ্রন্থাদি, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, আইন ইত্যাদি বিষয়ের প্রায় চল্লিশ লাখের এক বিশাল সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছিল।

অতীতের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোতে এসব ধ্বংসযজ্ঞের কারণে অনেক পুরোনো সভ্যতা ও ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারিনি। পরবর্তীতে অবশ্য যুদ্ধের আন্তর্জাতিক নীতিমালায় গ্রন্থাগারসহ সভ্যতার পরিচায়ক স্থাপনাসমূহ ধ্বংসের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কারণ গ্রন্থাগারগুলো পুরোনো সভ্যতাসমূহের পরিচয়, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে যুগ থেকে যুগ, শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধরে।

বাংলাদেশের যশোর, বরিশাল, রংপুর ও বগুড়ায় সর্বপ্রথম ১৮৫৪ সালে সরকারিভাবে ৪টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ৬৪টি জেলার প্রত্যেকটিতে গণগ্রন্থাগার রয়েছে। গণগ্রন্থাগার তৈরি করা হয় সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য। একটি দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়নসহ সব সূচকে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো অনেক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর পালিত হচ্ছে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস'। সরকার ৫ই ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এবারের দিবসটির স্লোগান- 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার'। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য এই দিনটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

গ্রন্থাগার এখন কেবলই গ্রন্থাগার নেই। এখন একে বলা হয় ইনফরমেশন সেন্টার বা তথ্যকেন্দ্র। বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে এ এক অপরিহার্য উপাদান। বর্তমানে এখানে শুধু বই-ই থাকে না। এখানে থাকে কম্পিউটারাইজড তথ্যসামগ্রী, অডিও-ভিডিও সামগ্রী, ই-বুক, ই-জার্নাল, আরো অসংখ্য আধুনিক তথ্যসামগ্রী। এখন আর গ্রন্থাগার চার দেয়ালের মধ্যেও আবদ্ধ নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন গ্রন্থাগার পৌঁছে গেছে মানুষের ঘরে ঘরে। ওপেক সেবার মাধ্যমে এখন ঘরে বসেই তথ্য অনুসন্ধান ও বই রিজার্ভ করতে পারছে ব্যবহারকারীরা। তথ্য থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ও বিভিন্ন মাধ্যমে থাকা জ্ঞানকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংগঠনের মাধ্যমে সঠিক গ্রাহককে সঠিক তথ্যটি সঠিক সময়ে প্রদান করে গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্র। চীন দেশের একটি প্রবাদের মাধ্যমেই লেখা শেষ করব। প্রবাদটি হলো– 'তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা করো তাহলে শস্য রোপণ কর, তুমি যদি দশ বছরের পরিকল্পনা করো তাহলে গাছ লাগাও, আর যদি হাজার বছরের পরিকল্পনা করে থাক তাহলে মানুষ তৈরি কর।' আসুন আমরা হাজার বছরের পরিকল্পনা করি। মানুষকে জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থাগারমুখী করি। গ্রন্থপাঠ করে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে। আর দেশ-বিদেশের সকল জ্ঞানকে প্রসারিত করে।

সরকারের উদ্যোগে ১২২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯টি জেলায় গণগ্রন্থাগার ভবন নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ৬টি জেলা গণগ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমুহ উন্নয়নের মাধ্যমে পাঠকদের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, সেবার মান উন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৭৫১৮টি গ্রন্থাগারের জন্য ২৪.০২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য সরকার গ্রহণ করেছে নানা কর্মসূচি।

প্রজন্ম পরম্পরায় শাণিত হোক আমাদের গ্রন্থাগারগুলো। বই পড়ার অভ্যাস, আলোর মিছিলের মতো ছড়িয়ে যাক মাইল থেকে বর্গমাইলে। শিশু, কিশোর, শিক্ষক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উজ্জীবিত হোক পাঠের আসরে। আর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রন্থাগার হোক উন্মুক্ত আবাসভূমি।

লেখক: সংগীতশিল্পী ও প্রাবন্ধিক

রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শপথ গ্রহণ স্মরণে ডাকটিকিট অবমুক্ত

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শপথ গ্রহণের দিনটি ছিল ২৫শে জানুয়ারি। ১৯৭৫ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন ও দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দিবসটি স্মরণে ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম ও ডাটাকার্ড প্রকাশ করেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ তার দপ্তরে দশ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট ও দশ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত এবং ৫ টাকা মূল্যমানের ডাটাকার্ড প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করা হয়। স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্‌বোধনী খাম পরবর্তীতে ঢাকা জিপিও-এর ফিলাটেলিক ব্যুরো ও অন্যান্য জিপিও এবং প্রধান ডাকঘরসহ দেশের সকল ডাকঘর থেকে বিক্রি করা হবে। উদ্‌বোধনী খাম ব্যবহারের জন্য চারটি জিপিওতে বিশেষ সিলমোহরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদন: সুব্রত কুমার দে

বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরি

অনুপম হায়াৎ

বই হচ্ছে কাগজে মুদ্রিত পাঠযোগ্য জ্ঞাননির্ভর আধার। আর লাইব্রেরি হচ্ছে একাধিক বইয়ের সংগ্রহ ও সংরক্ষণাগার। বহু লেখক, গবেষক, পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক বই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ লাইব্রেরিকে মহাসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এখানে ভাষা চুপ করে আছে, এখানে কান পাতলে জ্ঞান-সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়।

জাতির পিতা, মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ছিলেন বইবান্ধব, বইয়ের লেখক এবং লাইব্রেরিপ্রেমী, লাইব্রেরি সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা। বই, সংবাদপত্র ও লাইব্রেরি তাঁর মুক্তজীবন ও জেলজীবনে বিরাট অবদান রেখেছে নানাভাবে।

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরি

বঙ্গবন্ধুর বই পড়া শুরু হয় পারিবারিক পরিবেশে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক, ধর্মীয় পুস্তকের বাইরে তিনি পড়তেন দৈনিক ও মাসিক পত্রপত্রিকা। তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত পত্রিকা রাখা হতো। এ সম্পর্কে জানা যায় তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* থেকে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

> 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। *আনন্দবাজার*, *বসুমতী*, *আজাদ*, *মাসিক মোহাম্মদী* ও *সওগাত*। ছোটোকাল থেকেই আমি সকল কাগজই পড়তাম'। (পৃ. ১০)

পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম, আদর্শ ও মানস গঠনে সংবাদপত্র ও বই পাঠ অব্যাহত ছিল। নিজের বাড়িতে গড়ে তুলেছিলেন দেশ-বিদেশের শত শত বই-পুস্তক সংবলিত এক বিরাট লাইব্রেরি।

১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে বঙ্গবন্ধু স্ত্রী, কন্যা, পুত্রসহ বসবাস শুরু করেন। এই বাড়িতেই তিনি গড়ে তোলেন লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরি গঠনে সহায়তা করেন তাঁর স্ত্রী-সন্তানরাও।

শেখ হাসিনার স্মৃতিময় বর্ণনা

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে ব্যক্তিগত পাঠাগারে আলমারি ভর্তি বইয়ের পাশে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসা অবস্থায় বইপ্রেমী বঙ্গবন্ধুর একটি আলোকচিত্র ইতিহাসের উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে। ধানমন্ডির বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরি ও সংগৃহীত বই সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আবেগঘন স্মৃতিময় বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন–

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়েছিল এই বাড়িটি। রাত ১২.৩০ মিনিটে আব্বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিলেন। আর সেই খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেওয়া হল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতারা তা প্রচার শুরু করলেন। যে মুহূর্তে এই খবর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে পৌঁছাল তারা আক্রমণ করল এই বাড়িটিকে। রাত ১.৩০ মিনিটে তারা আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আজ মনে পড়ে সে স্মৃতি। লাইব্রেরি ঘরের দক্ষিণের যে দরজা তারই পাশে টেলিফোন সেটটি ছিল। ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছিলেন, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২৬ মার্চ পুনরায় এই বাড়ি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। মা, রাসেল, জামাল ও কামাল কোনোমতে দেয়াল টপকিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাড়িতে ঢুকে লুটতরাজ শুরু করে। প্রতিটি ঘর তারা লুট করে, ভাঙচুর করে, বাথরুমের বেসিন, কমোড, আয়না সব ভেঙে ফেলে। কয়েকজন সেনা বাড়িতে থেকে যায়। দীর্ঘ নয়মাস ধরে এই বাড়ি লুট হতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা এক গ্রুপ লুট করে যাবার পর আরেক গ্রুপ আসত। সোনা-দানা, জিনিসপত্র সবই নিয়েছে। আমরা সব এক কাপড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমার এবং মা'র যে গহনা লকারে ছিল সেগুলি বেঁচে যায়, কিন্তু চাবি হারিয়ে যায়।

ছয় দফা দেবার পর অনেক সোনা-রূপার নৌকা, ছয় দফার প্রতীক প্রায় ২-৩শ' ভরি সোনা ছিল। এগুলি আমার ঘরের স্টিলের আলমিরায় রাখা ছিল। সব লুট করে নিয়ে যায়। যাক, ওসবের জন্যে আফসোস নেই, আফসোস হল বই। আব্বার বহু পুরোনো কিছু বইপত্র ছিল বিশেষ করে জেলখানায় বই দিলে সেগুলি সেন্সর করে সিল মেরে দিত। ১৯৪৯ সাল থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন, কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল, যা সবসময় আব্বার সঙ্গে যেত।

জেলখানায় বই বেশিরভাগই জেল লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন, কিন্তু আমার মা'র অনুরোধে এই বই কয়টা আব্বা কখনো দিতেন না, সঙ্গে নিয়ে আসতেন।

তাঁর মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী, শরৎচন্দ্র, নজরুলের রচনা, বার্নার্ড শ', বার্ট্রান্ড রাসেল, শেলী ও কীটসসহ বেশ কয়েকখানা বই। এর মধ্যে কয়েকটা বইতে সেন্সর করার সিল দেওয়া ছিল। জেলে কিছু পাঠালে সেন্সর করা হয়, অনুসন্ধান করা হয় তারপর পাস হয়ে গেলে সিল মারা হয়। পর পর আব্বা কতবার জেলে গেলেন তার সিল এই বইগুলিতে ছিল।

মা, এই কয়টা বই খুব যত্ন করে রাখতেন। আব্বা জেল থেকে ছাড়া পেলেই খোঁজ নিতেন বইগুলি এনেছেন কিনা। যদিও আব্বাকে অনেক বই জেলে পাঠানো হত। মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউ মার্কেটে মার সঙ্গে আমরাও যেতাম। বই পছন্দ করতাম, নিজেরাও কিনতাম। সব সময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল। প্রচুর বই ছিল। সেই বইগুলি ওরা নষ্ট করে। বইয়ের প্রতি ওদের আক্রোশও কম না। আমার খুবই কষ্ট হয় ঐ বইগুলির জন্যে। ঐতিহাসিক দলিল হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে তা সবই হারালাম।

১৯৮১ সালে আমি ফিরে এসে বাড়িটি খুলে দিতে বলি, কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান অনুমতি দেয়নি। এমনকি বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতিও পাইনি। মিলাদ পড়ানোর জন্যেও বাড়ির দরজা খুলে দেয়নি জিয়া। রাস্তার ওপর বসেই আমরা মিলাদ পড়ি।

জেনারেল জিয়া সরকারের পক্ষ থেকেই আমাকে থাকার জন্যে বাড়ি দেবার প্রস্তাব পাঠানো হয়। আমি একজন স্বৈরাচারের হাত থেকে কিছু নিতে অস্বীকার করি। আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম আছে প্রয়াত রাষ্ট্রপতির পরিবারকে একটি বাড়ি, একটি ফোন, ভাতা, গাড়ি ইত্যাদি কিছু সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্র দিয়ে থাকে (যেমন জেনারেল এরশাদ সরকারের কাছ থেকে জিয়ার স্ত্রী ও পরিবার গ্রহণ করতেন)। আমরা কোনোদিনই কোনোকিছু গ্রহণ করিনি।

জেনারেল জিয়া নিহত হবার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার এই বাড়ির দরজা খুলে দেন। দেশে যখন আবার মার্শাল ল' জারি হয়, এই বাড়িটি বিরোধী দলের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ছিল। যদিও দোতলা বা সিঁড়ি আমরা ব্যবহার করিনি কখনো, কেবলমাত্র বসার ঘর আর লাইব্রেরি ঘরটা ব্যবহার করেছি, মিটিং করেছি। অনেক জরুরি পরিস্থিতিতে বহু মিটিং হয়েছে এখানে। ১৯৮৩ সালের ২১ জানুয়ারি মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে আমি এই বাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের এই বাড়িটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনার নীরব সাক্ষী। জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণসহ বহু ঘটনা এই বাড়িতে ঘটেছে।

আবার ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর আমাকে গ্রেফতার করে এই বাড়িতে আনা হয়। ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পতন পর্যন্ত এই বাড়িতে গৃহবন্দি হিসেবে অবস্থান করে আমরা রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাই। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের সকল কাজ এই বাড়িতে বসে করি।

এই বাড়িটি যখন ১২ জুন, ১৯৮১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের নির্দেশে খুলে দেওয়া হল, তখন বাড়িটির গাছপালা বেড়ে জঙ্গল হয়ে আছে। মাকড়সার জাল ঝুল, ধুলোবালি, পোকামাকড়ে ভরা। ঘরগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন। গুলির আঘাতে লাইব্রেরি ঘরের দরজা ভাঙা, বইয়ের আলমারিতে গুলি-কাচ ভাঙা, বইগুলি বুলেটবিদ্ধ, কয়েকটা বইয়ের ভিতরে এখনো বুলেট রয়েছে। একটা বইয়ের নাম ছিল *শ্রদ্ধাঞ্জলী*, বইটির উপরে কবি নজরুলের ছবি। বইটির ভিতরে একখানা আলগা ছবি একজন মুক্তিযোদ্ধার বুলেটের আঘাতে বইটি ক্ষতবিক্ষত। মুক্তিযোদ্ধার ছবিটির বুকের উপর গুলি। ঠিক ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে এ বাড়িতে যে আক্রমণ হয় তা হল ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ। এ বইটির দিকে তাকালে যেন সব পরিষ্কার হয়ে যায়'।

[শেখ হাসিনা, 'স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনার' উদ্ধৃত, মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, ২০১২ (পৃ:৯৭-৯৮)।]

শেখ হাসিনার এ বর্ণনা থেকে লাইব্রেরি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যগুলো হচ্ছে:

(ক) লাইব্রেরিটি দেশি-বিদেশি গ্রন্থে পূর্ণ ছিল। এর মধ্যে ছিল অনেক পুরোনো বইও।

(খ) বঙ্গবন্ধু জেলে গেলে এ লাইব্রেরি থেকে কিছু নির্দিষ্ট বই তাঁকে সরবরাহ করা হতো। যেসব বই জেলখানায় দেওয়া হতো তাতে জেল কর্তৃপক্ষের সেন্সরকৃত সিল মারা থাকত।

(গ) জেলখানায় পাঠানো বইয়ের বেশিরভাগই বঙ্গবন্ধু ওখানকার লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন।

(ঘ) বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরিতে ছিল রবীন্দ্র রচনাবলি, শরৎ রচনাবলি, নজরুলের রচনা, বার্নার্ড শ, রাসেল-কীটসের রচনাসমূহ।

(ঙ) স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন নেছা ও কন্যা শেখ হাসিনা অনেক বই কিনতেন বঙ্গবন্ধুর জন্য।

(চ) ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আক্রমণ করে। এ সময় তারা অনেক মূল্যবান বই নষ্ট করে।

(ছ) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ রাতে এই লাইব্রেরি ঘরের দক্ষিণের দরজার পাশেই রাখা টেলিফোন থেকে বঙ্গবন্ধু বংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(জ) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাতে কতিপয় সেনার হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহিদ হন। সেই রাতে সেনা আক্রমণের শিকার হয় বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরি এবং এর বইপত্রও।

সাংবাদিক রবার্ট পেইনের বর্ণনা

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক, সাংবাদিক, রবার্ট পেইন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাগারে জর্জ বার্নার্ড শ', বার্ট্রান্ড রাসেলের রচনাবলি এবং বুকশেলফে বাঁধাই মাও সেতুং-এর স্বাক্ষরিত ছবির কথা উল্লেখ করেছেন। (রবার্ট পেইন, উদ্ধৃত, শহীদুল হক খান, *বঙ্গবন্ধু সকলের*, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫০)।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে খবরের কাগজ এবং বই পড়া– সেই কিশোর খোকা শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতারূপে স্বীকৃতি পেয়ে বিশ্ববন্ধু হয়েছিলেন। তাঁর এই নেতৃত্ব ও কৃতিত্ব অর্জনের পেছনে বই এবং লাইব্রেরির বিশেষ অবদান রয়েছে। বিশ্ব গণমাধ্যমে 'রাজনীতির কবি' শিরোনাম পাওয়া বঙ্গবন্ধু ছিলেন বইয়ের লেখক, ছিলেন বইয়ের বন্ধু, ছিলেন লাইব্রেরির বন্ধুও। তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দর্শন ও সংগ্রাম নক্ষত্রের বিচ্ছুরিত মন্তাজ হয়ে বাঙালি জাতিকে দেখাবে এগিয়ে চলার পথ।

লেখক: চলচ্চিত্রকার, গ্রন্থকার, গবেষক ও শিক্ষক

প্রমিত বাংলা বানান ও উচ্চারণ

সায়েরে নাজাবী সায়েম

বাংলা ভাষা আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে। বাংলা আমাদের অহংকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলার সঠিক ব্যবহার আমাদের জানা অনেক জরুরি। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং শুদ্ধ চর্চার ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা বানান ও বাংলা উচ্চারণ রীতির গুরুত্ব আকাশ সমান।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ত্যাগে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল বাঙালি জাতি। ভাষার ওপর আঘাত এলে, সংখ্যাগুরু বাঙালির ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে বাংলা ভাষা সংগ্রামীরা সোচ্চার হয়েছিলেন প্রধানত যে কারণে– তা হচ্ছে মাতৃভাষা যদি যোগাযোগের মাধ্যম না হতে পারে তবে তা সামগ্রিকভাবে বাঙালিকে পিছিয়ে দেবে। উর্দুতে কথা বলতে না পারা বাংলাভাষী জেলে মাছের ন্যায্য দাম পাবে না। লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়বে বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা। ফলে তাদের জন্য চাকরির সুযোগ কমে আসবে। আর সবচেয়ে বড়ো ক্ষতিটা হতো বাংলা ভাষারই। হাজার বছরের বাংলা ভাষা পরিণত হতো মৃত ভাষাতে।

বাংলা ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি হলো। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যে বৈষম্য আর অবিচার করছিল, তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী বাঙালিরা। এই প্রতিবাদী চেতনা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল স্বাধীনতাযুদ্ধে। লাখো শহিদের আত্মত্যাগ ও লাখো নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৯৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হচ্ছে, যা বাংলা ভাষার বৈশ্বিক মর্যাদারই উদাহরণ।

প্রমিত বাংলা বানান ও বাংলা উচ্চারণ রীতি

শুদ্ধ বানান-রীতি ছাড়া ভাষার শুদ্ধ লিখিত রূপ সম্ভব নয়। বানানের ও উচ্চারণের ওপরই ভাষার শুদ্ধতা ও সঠিক অর্থ প্রকাশ নির্ভর করে।

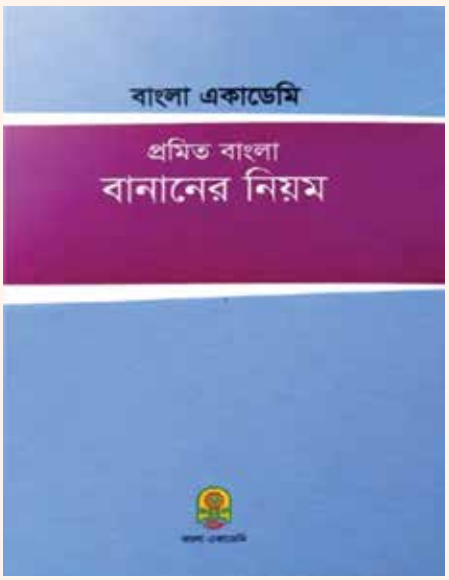

বাংলা ভাষায় দুটি 'ই' আছে– ই এবং ঈ। 'শ' আছে তিনটি– স, শ, ষ। এছাড়াও এই ভাষায় দেশি, বিদেশি, তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম শব্দের বাহুল্য রয়েছে। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে প্রমিত বানান রীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আয়ত্ত করার মাধ্যমে শুদ্ধভাবে বাংলা লেখা ও বলা সহজ হয়।

ভাষার যথার্থ ভাব প্রকাশ ও শুদ্ধ

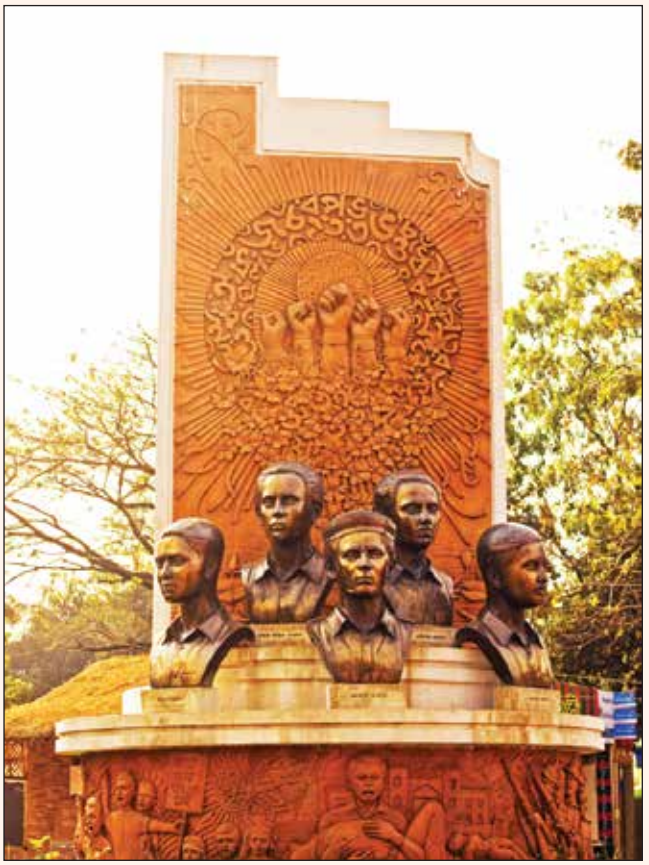

অনুশীলন দরকার ভাষার মাধ্যমে সঠিক যোগাযোগ স্থাপন করতে। শুদ্ধভাবে বাংলা বলা ও লেখা বাংলা ভাষাকে সঠিকভাবে মনের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে। আর তাই আত্মপ্রকাশকে সার্থক, কার্যকর ও সফল করতে হলে প্রমিত বানান রীতি ও উচ্চারণ রীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যথার্থভাবেই শিক্ষিত হয়ে ওঠেন, যদি তার ভাষার ওপর সত্যিকারের দখল থাকে। একজন স্যুট-টাই পরা বিশিষ্ট ব্যক্তি মঞ্চে দাঁড়িয়ে যদি ভুল উচ্চারণে বক্তব্য রাখেন, তবে তার বিশিষ্টতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুদ্ধ উচ্চারণে সুন্দর করে কথা বললে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। তাই ভাষা শুদ্ধভাবে লিখলেই শুধু চলবে না, কথ্য ভাষাও শুদ্ধ ও প্রমিতরূপে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

বাস্তবতার বর্ণনা

বাংলাদেশের বাঙালি কেবল বাঙালি নয়, একটি জাতিরাষ্ট্রের মালিক। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের অধিকারী নয়। তাই সেখানে হিন্দির দাপটে বাংলাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে কষ্ট করে। কিন্তু বাংলাদেশে এমন হওয়ার কথা না থাকলেও হিন্দির দাপট, ইংরেজির শাসন আর আঞ্চলিক ভাষার জোরালো উপস্থিতিতে শুদ্ধ বাংলাকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়নি। সর্বস্তরে প্রমিত বাংলা ভাষা ও বানান-রীতির প্রচলন করা যায়নি, যা খুবই জরুরি।

বাংলাদেশের মানুষের ভাষা তাই 'ভাষাদূষণ'-এর ফলে তিন রকমের বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে।

এক. ইংরেজি শব্দদুষ্ট এবং ইংরেজি ঢঙে বাংলা– 'র' উচ্চারণ 'ড়', 'এ' উচ্চারণ 'এ্যা'। এফএম রেডিওতে প্রায়ই এরকম শুনতে পাই

'বন্ধুরা, আপনারা আপনাদ্যার ফেইভারিট সঙের নাম এসএমএস কড়ে পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়'।

দুই. হিন্দি-উর্দু শব্দদুষ্ট মিশ্রিত বাংলা বলার সময় প্রতিবেশী দেশের টিভি চ্যানেল থেকে শেখা হিন্দি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে।

তিন. আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট বাংলা শব্দ বা বাক্য– বাংলার সঙ্গে আঞ্চলিক উচ্চারণে ইংরেজি শব্দের মিশ্রণও ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর মুখে 'টিচার' না বলে 'টিসার' উচ্চারণ এর উদাহরণ, যেখানে 'চ'-এর উচ্চারণ করছে 'স'।

অপ্রমিত বাংলা চর্চার বিপদ

ক. এফএম রেডিও পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য সাধারণের মুখের অপ্রমিত ভাষাকে স্মার্টনেস হিসেবে দাঁড় করাচ্ছে বলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এই ভাষাকে গ্রহণ করছে। ক্রমশ বাংলা ভাষা বিকৃত থেকে বিকৃততর হয়ে যাচ্ছে।

খ. বাংলা শব্দের ব্যবহার সীমিত করে ইংরেজি-হিন্দি-উর্দু ভাষার শব্দের আধিক্য ঘটলে এক সময় চর্চার অভাবে বাংলা ভাষার শব্দগুলো হারিয়ে যাবে।

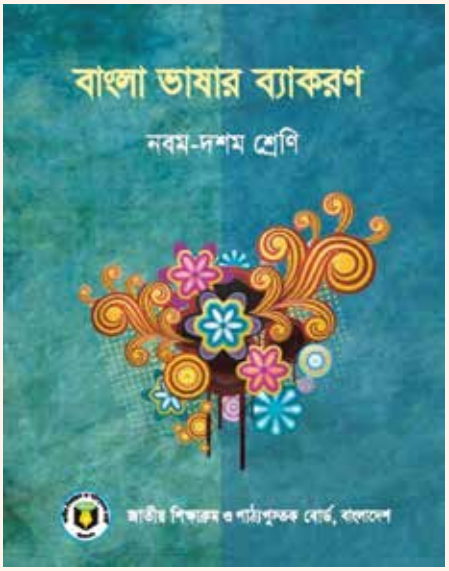

গ. প্রমিত উচ্চারণ ও বানান-রীতির প্রচলন কমে গেলে কথ্য ও লিখিত বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও এর কাঠামোর বিকৃতি ঘটবে। ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। ফলে বাংলাভাষীদের নিজের ভাষায় চিন্তা করার শক্তি কমে যাবে। এক সময় তা চিন্তার সীমাবদ্ধতা তৈরি করবে, চিন্তার প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে। এখনি 'কিন্তু' না বলে 'বাট', 'যেমন' না বলে 'লাইক', 'কাজেই' না বলে 'সো' বলা হচ্ছে অহরহ। 'কিন্তু', 'যেমন', 'কাজেই' শব্দগুলো বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

ঘ. বাংলা ভাষায় যত বিদেশি ভাষার দখল ঘটবে, বাংলা ভাষা তত বেশি পরাধীন হয়ে পড়বে। বাংলা যদি বাংহিংলিশ ভাষাতে পরিণত হয়, তবে সমূহ বিপদ ঘটবে। ভাষাটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য কমে গেলে এটি 'অভিধান-নির্ভর' এবং নির্জীব হয়ে পড়বে। তখন হয়ত সন্দেহ তৈরি হবে বাংলা ভাষার সামর্থ্য নিয়ে। বিজ্ঞান-দর্শনের চিন্তা বাংলাতে প্রকাশ করা সম্ভব কি না, এরকম ভাবনা আসতে পারে।

ঙ. বাংলা ভাষার জয় বাঙালির জয় হিসেবে ইতিহাসে দেখা গেছে। একইভাবে বাংলা ভাষার পরাজয় বাঙালির শিক্ষা-সংস্কৃতি-নিজস্বতার পরাজয় ঘটাবে, সে আশঙ্কার জন্ম হয়।

চ. জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা ভাষা, এরকম দাবি পূরণ হবে ভবিষ্যতে। বিদেশে প্রমিত বাংলা ভাষার পরিবর্তে অশুদ্ধ বাংহিংলিশ বা আঞ্চলিক কোনো ভাষা, যেমন 'সিলেইট্যা বাংলা; বা 'চাটগাইয়া বাংলা' প্রচলিত হলে বাংলা ভাষার সামগ্রিক শক্তির খর্ব হবে। সবাই সিলেটের আঞ্চলিক উচ্চারণের বাংলা বুঝবেন না, তেমনি বুঝবেন না চট্টগ্রামের বাংলা। সব বাংলাদেশির বাংলা ভাষাকে এক ছাদের তলায় আনতে হলে প্রমিত বাংলাকেই বেছে নিতে হবে।

ছ. প্রমিত বাংলা উচ্চারণ না হলে বিশাল বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যদি প্রধান অতিথির ভাষণে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের 'ঝরে পড়া' (ড্রপ আউট) বোঝাতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা 'ঝড়ে পড়া' বলেন, তাহলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

প্রমিত বাংলা বানান ও বাংলা উচ্চারণ রীতির গুরুত্ব

মহান ভাষা আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি ছিল সর্বস্তরে বাংলা ভাষার চর্চা হবে, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটবে। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি বাড়াতে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করা হবে। এত বছর পার হয়ে গেলেও দেশের প্রতিটি অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা সর্বস্তরে শুদ্ধভাবে বাংলায় কথা বলা, বাংলায় লেখা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা যায়নি। উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার এখনো সীমিত। উচ্চ আদালতেও বাংলা ভাষার একই অবস্থা।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাংলাকে বাংহিংলিশ ভাষাতে পরিণত করা হচ্ছে। শিক্ষিত বাঙালিও এ ব্যাপারে সচেতন নন। ফলে অহেতুক বাংলা বাক্যে বাংলার সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দের মিশ্রণ ঘটানো হচ্ছে, যা চাইলেই এড়ানো সম্ভব। চীনের মানুষজন যখন চীনা ভাষায় কথা বলে, তখন তারা অন্য ভাষার শব্দের মিশ্রণ ঘটায় না। মনের ভাব প্রকাশ করতে তারা নিজের ভাষার শব্দকেই ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষাভাষীদের সচেতনতা জরুরি প্রয়োজন।

ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োজনটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত বাঙালির আবেগ প্রকাশের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায়, আর তা প্রমিত বাংলাতে যখন ঘটে, তখন তা সব অঞ্চলের বাঙালির কাছে বোধগম্য হয় বেশি। আর তাই প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার সবচেয়ে দরকার সংবাদপত্রে, রেডিও বা টেলিভিশনের সংবাদ পাঠ, গান, সাহিত্য, নাটকে, স্কুলের পাঠ্যবইয়ে, সরকারি অফিসের কাজে। রেডিও-টেলিভিশনে আঞ্চলিক ভাষার প্রকাশ থাকবে, তবে কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষার অতি প্রয়োগ অন্য অঞ্চলের মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুলবে। এক্ষেত্রে প্রমিত ভাষা সবার জন্য এক গণতান্ত্রিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

ভাষা শহিদদের সম্মানে বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে লেখা ও বলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। প্রমিত বাংলা ভাষাই পারে সকল অঞ্চলের বাংলাভাষীকে একতাবদ্ধ রাখতে। অসচেতন হয়ে অনেকে প্রমিত বাংলা ভাষা চর্চাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করছেন। মাতৃভাষার শুদ্ধ চর্চা ছাড়া কোনো জাতি স্বকীয়তা বজায় রেখে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে পারে না, তা এখন সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। তাই মহান ভাষা আন্দোলনের অমর ফেব্রুয়ারিতে আমাদের হোক অঙ্গীকার– সর্বস্তরে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার।

লেখক: শিক্ষার্থী, প্রথম বর্ষ, আইন বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যানসার থেকে শতভাগ সুস্থ হওয়া শিশুদের সঙ্গে বিএসএমএমইউ'র চিকিৎসকরা

সচেতনতায় শিশু ক্যানসার নিরাময় হয়

সুরাইয়া সুলতানা

শিশুরাই আগামী দিনের সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। কিন্তু ক্যানসার একটি নীরব ব্যাধি। এই মরণব্যাধি ক্যানসারের আক্রমণে অকালে সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় অনেক শিশুকে। ওয়ার্ল্ড চাইল্ড ক্যানসারের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর ২ লাখ শিশু ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। আর এর মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশগুলোতেই আক্রান্ত হয় শতকরা ৮০ ভাগ। এখানে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের বেঁচে থাকার হার মাত্র ৫ ভাগ। অন্যদিকে, উন্নত দেশগুলোয় এই হার ৮০ ভাগ। বাংলাদেশে প্রায় ১৩ থেকে ১৫ লাখ ক্যানসারে আক্রান্ত শিশু রয়েছে। ২০০৫ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। আর সচেতন না হলে ২০৩০ সালে এ হার দাঁড়াবে ১৩ শতাংশ।

ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ না থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জেনেটিক্যাল কারণ, ভাইরাস, খাবারে টক্সিনের উপস্থিতি, ক্যামিকেল, পরিবেশগত সমস্যায় শিশুদের ক্যানসার হয়। সচেতনতা, সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের জীবন বাঁচানো সম্ভব।

শিশুদের ক্যানসারের কিছু লক্ষণ রয়েছে। এ উপসর্গগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। কারণ প্রথমেই ধরা পড়লে শিশুটির জীবন রক্ষা পেতে পারে। নিম্নে শিশুদের ক্যানসারের লক্ষণগুলো হলো– ১. নাক থেকে ঘন ঘন রক্তপাত ২. ক্ষত না সারা ৩. গ্রন্থি (লিম্ফ নোড) ফুলে ওঠা ৪. ওজন কমে যাওয়া ৫. লঘু শ্বাস-প্রশ্বাস ৬. ব্যাখ্যাতীত জ্বর ৭. শরীরে চাকার মতো অনুভব করা ৮. দুর্বলতা ৯. স্বভাবে অভাবনীয় পরিবর্তন ১০. মাথাব্যথা ১১. বমি করা ১২. চোখে দেখতে অসুবিধা ১৩. ফিট বা অচেতন হওয়া ১৪. হাড়ে বা শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা ১৫. মলমূত্র ও বমির সঙ্গে রক্তপাত ইত্যাদি। উল্লেখিত এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ ধরা পড়লে ক্যানসার নিরাময় করা সহজ হয়।

শিশুদের সঠিক চিকিৎসার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার যেমন: পালং শাক, ব্রোকলি, ডিমের কুসুম, মটরশুটি, কলিজা, মুরগির মাংস, কচুশাক, কলা, মিষ্টি আলু, কমলা, শালগম, দুধ, বাঁধাকপি, বরবটি, কাঠ বাদামের মতো ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশুদের ক্যানসার মোকাবিলায় সবার আগে সমাজের প্রত্যেক স্তরে বাড়াতে হবে সচেতনতা এবং এজন্য প্রতিবছর এই বিষয়ে সর্বমহলে জানান দেওয়ার জন্য ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস' পালন করা হয়। ২০২০ সালের শিশু ক্যানসার দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল–No Child Should Die of Cancer.Cure for more and Care for All.

শিশু ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০২ সালে চাইল্ড ক্যানসার ইন্টারন্যাশনাল (সিসিআই) কর্তৃক এ দিবসটি পালন শুরু হয়। সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়াও এ দিবসটির অন্যতম লক্ষ্য হলো শিশুমৃত্যু হার হ্রাস করা এবং ক্যানসার সম্পর্কিত ব্যথা ও এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা শিশুদের দুর্দশা হ্রাস করা। ২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে ৬০ শতাংশ বেঁচে থাকার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সিসিআই অনুযায়ী, সারা বিশ্বে প্রতিবছর তিন লাখেরও বেশি শিশুর জন্মের ১৯ বছরের মধ্যে ক্যানসার ধরা পড়ে এবং প্রতি ৩ মিনিটে একটি শিশু ক্যানসারে মারা যায়। ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে বেশির ভাগই লিউকোমিয়া।

পেডিয়াট্রিক অনকোলজি ন্যাশনাল ডাটাবেইজ(পিওএনডি) সূত্রে জানা যায়, জিনগত কারণ ছাড়াও নগরায়ণের পরোক্ষ প্রভাবে শিশুদের মধ্যে ক্যানসারের ঘটনা বাড়ছে। ভাইরাস,দূষণ এবং বিকিরণের মাত্রা বৃদ্ধি ক্যানসারের মূল কারণ। অধিক মাত্রায় অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও উন্নয়ন শিশুদের শরীরে ক্যানসারে জন্ম দিচ্ছে। তাই সুস্থ ও ক্যানসারমুক্ত প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব নগরায়ণকে প্রাধান্য দিতে হবে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, অধিকাংশ শিশু ক্যানসার চিকিৎসাযোগ্য। প্রাপ্তবয়স্ক ক্যানসারের তুলনায় শিশু ক্যানসারের ক্ষেত্রে আরো সফলভাবে চিকিৎসা করা যায়। অসংক্রামক এ রোগের প্রকোপ বাড়ছে বিশ্বব্যাপী। ভেজাল খাদ্য গ্রহণ, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, সচেতনতার অভাব, সঠিক তথ্য না জানা ইত্যাদির কারণে এ অসংক্রামক রোগটি বেড়েই চলেছে এবং ফুটফুটে সুন্দর শিশুদের জীবনাবসান হচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে হবে। আশার বাণী হলো, সরকার ইতোমধ্যে দেশের সব বিভাগে ১০০ শয্যার ক্যানসার হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল এই চিকিৎসার সহজলভ্যতা বিভাগ পর্যন্ত নিশ্চিত করতে পারলে সারা দেশের লাখ লাখ মানুষ কম খরচে এই সেবা পেতে পারবে। তাদেরকে আর রাজধানীমুখী হতে হবে না বলে মনে করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহেদ মালেক। এককালীন আর্থিক অনুদান ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রদান করছে সরকার। বাংলাদেশে এখন ক্যানসারের চিকিৎসা পর্যাপ্ত রয়েছে। তাই শিশুদের ক্যানসার হলে পরিবারকে ভেঙে না পড়ে দ্রুত তাদের চিকিৎসা করাতে হবে সঠিক উপায়ে। তাহলেই তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।

লেখক: প্রাবন্ধিক

অনিন্দ্য সুন্দর সুন্দরবন

সাইমন ইসলাম সাগর

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'– সত্যিই এমন দেশ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রানি আমাদের বাংলাদেশ। মায়াবী রূপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম নিদর্শন 'সুন্দরবন'। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এর বিস্তৃতি। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার নিয়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার পড়ে বাংলাদেশে, আর বাকিটা ভারতে। বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে স্বীকৃতি প্রদান করে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তসীমা ও বঙ্গোপসাগরের প্রায় সমতলে গড়ে উঠেছে এ ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

সামুদ্রিক স্রোতধারা, কাদা, চর, নদী, খাল, ম্যানগ্রোভ বনভূমি এবং লবণাক্ততাসহ ছোটো ছোটো দ্বীপ সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রেখেছে। সুন্দরবনের মোট বনভূমির মধ্যে ৯,৮৭৮ বর্গকিলোমিটার জলের এলাকাজুড়ে রয়েছে নদীনালা, খাঁড়ি, বিল। এখানে শুধু নোনা পানিই নয়, সুন্দরবনের বুক চিরে প্রবাহিত হয় স্বাদু পানির ধারাও। আবার জোয়ার-ভাটার কারণে এই বনভূমিতে জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ততার প্রভাব সুস্পষ্ট। ফলে সুন্দরবনের বৃক্ষের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য ম্যানগ্রোভ বনভূমির বৃক্ষের মধ্যকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যই অন্যান্য ম্যানগ্রোভ বন থেকে সুন্দরবনকে পৃথক করে রেখেছে। সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি হচ্ছে সুন্দরী এবং গেওয়া। এছাড়া গড়ান, পশুর, বাইন, হেঁতাল, গোলপাতা, খাসু, লতা সুন্দরী, কেওড়া, ধুন্দুল, আমুর, ছৈলা, ওড়া, ঝাঁকড়া, সিংরা, ঝানা, খলশি ইত্যাদি গাছও রয়েছে। বলেশ্বর, গড়াই, শিবসা ও রূপসা নদীর মিলিত মিঠাপানির প্রবাহের কারণে সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জে সুন্দরী গাছের ঘনত্ব এবং সংখ্যা অধিক। ডেভিড চেইন ১৯০৩ সালে সুন্দরবন ও সংলগ্ন এলাকার গাছপালার ওপর তাঁর লিখিত বইয়ে ৩৩৪টি উদ্ভিদ প্রজাতির কথা উল্লেখ করেছেন। ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল ও ১৩ প্রজাতির অর্কিডও রয়েছে সুন্দরবনে। ম্যানগ্রোভ বনের ৫০টি প্রজাতির মধ্যে ৩৫টি প্রজাতির উদ্ভিদের দেখা মেলে এই বনে।

সুন্দরবন প্রায় ২৮৯ প্রজাতির স্থলজ প্রাণীর বসবাস। এছাড়া আছে প্রায় ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর, বিভিন্ন প্রজাতির মাছসহ প্রায় ২১৯ প্রজাতির জলজ প্রাণী। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও সুন্দরবনে রয়েছে চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, রেসাস বানড়, বন বিড়াল, সজারু, উদ বিড়াল, বন্য শুকর প্রভৃতি। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, সুন্দরবনে রয়েছে ১১৪টি বাঘ, ১,০০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ চিত্রা হরিণ, ২০,০০০ বানর এবং ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ বন্য শুকর। স্থানীয় বা আবাসিক প্রায় ৩২০ প্রজাতির পাখির বসবাস এই বনে। এছাড়া প্রায় ৫০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি দেখা যায় এই বনে, যার অধিকাংশই হাঁসজাতীয়। নদীনালার কিনারায় অহরহ বিচরণ করতে দেখা যায় বক, সারস, হাঁড়গিলা, কাদা-খোঁচা, লেনজা, হট্টিটিসহ অসংখ্য উপকূলীয় পাখি। বিভিন্ন প্রজাতির গাংচিল, জলকবুতর, টার্ন, চিল, ঈগল, শকুন প্রভৃতি যেন সমুদ্র এবং বড়ো বড়ো নদীর উপকূল ভাগের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, ভগীরথ, পেঁচা, মধুপায়ী, বুলবুল, শালিক, ফিঙে, বাবুই, ঘুঘু, বেনে হাঁড়িচাঁচা, ফুলঝুরি, মুনিয়া, টুনটুনি ও দোয়েলসহ নানা ধরনের গায়ক পাখি– পাখিপ্রেমীদের মনে শিহরণ জাগায়। পাখি বিষয়ক পর্যবেক্ষণ, পাঠ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে সুন্দরবন যেন পাখি বিজ্ঞানীদের জন্য এক স্বর্গ।

জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুন্দরবনের মধুর চাহিদা রয়েছে দেশব্যাপী। বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ১২০ প্রজাতির মাছ রয়েছে সুন্দরবনে। দেশের বনজ সম্পদের একক বৃহত্তম উৎস সুন্দরবন। কাঠের উপর নির্ভরশীল কাঁচামালের জোগান দিয়ে যাচ্ছে এ বন। নিয়মিত ব্যাপকভাবে আহরণ করা হচ্ছে ঘর ছাওয়ার পাতা, মৌচাকের মোম, মাছ, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক। পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ সুন্দরবন। এখানকার কটকা, হিরণ পয়েন্ট, দুবলার চর, টাইগার পয়েন্টে (কচিখালী) প্রতিবছর পর্যটকদের প্রচুর সমাগম ঘটে। প্রতিবছর এই খাত থেকে বাংলাদেশের আয় কয়েকশ কোটি টাকা। সুন্দরবন বছরে গড়ে প্রায় ১৬ কোটি মেট্রিক টন কার্বন ধরে রাখতে সক্ষম, যার আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য ৫ থেকে ৬ বিলিয়ন ডলার। আবার সুন্দরবন বরাবরই আমাদের জন্য সুরক্ষাপ্রাচীর। সিডর, আইলা, বুলবুল, আম্পানসহ একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবন দাঁড়ায় বাধার দেয়াল হয়ে। নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, অসংখ্য উদ্ভিদ আর প্রাণী হারিয়েও রক্ষা করে আমাদের। বিবিসি'র তথ্য অনুযায়ী,

'অনিন্দ্য সুন্দরবন' কথাটা যেন সুন্দরবনের বেলায় অবলীলায় বলা যায়। এই সৌন্দর্য ধরে রাখতে এবং আমাদের নিজেদের বাঁচার স্বার্থে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে। ২০০১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের আওতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রূপান্তর ও পরশের উদ্যোগে এবং দেশের আরো ৭০টি পরিবেশবাদী সংগঠনের অংশগ্রহণে প্রথম জাতীয় সুন্দরবন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ১৪ই ফেব্রুয়ারিকে 'সুন্দরবন দিবস' ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৪ই ফেব্রুয়ারি সুন্দরবন দিবস পালিত হচ্ছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

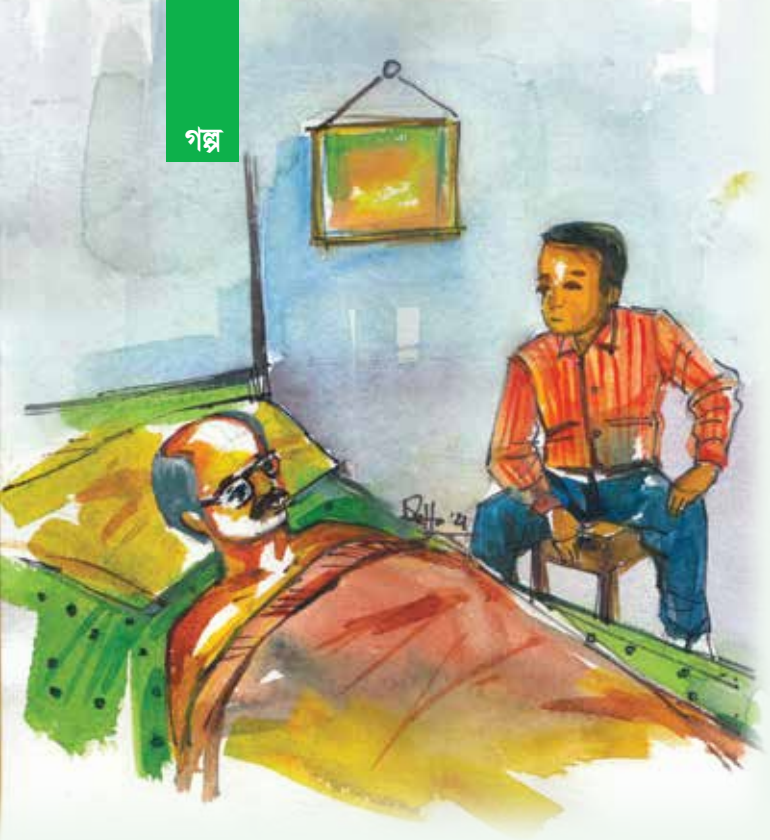

বাবা ও বাংলা ভাষার গল্প

জব্বার আল নাঈম

বাবা অসুস্থ। হাঁটতে পারেন না। কথা আটকে যাচ্ছে বার বার। দিনের অধিকাংশ সময় শুয়ে থাকেন। মাঝেমধ্যে বসার চেষ্টা করেন, তাও অন্যের সহযোগিতায়। বসিয়ে দিলেও থাকতে পারেন না, ধরে রাখতে হয়। বালিশ-বেষ্টনীতে রাখতে হয়। মায়ের অনুপস্থিতিতে বাবা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। শরীরের কোনো অংশই বুঝ মানছে না। একটা সময় বাবার শরীরের চামড়া আজকের আমার মতোই টান টান ছিল। এখন কুচকে গেছে। শরীরের প্রতি অঙ্গ অংশে ভাঁজ। এখন ঠিকঠাক কিছুই দেখতে পারছেন না। মাঝে মধ্যে আমাকেও চিনতে কষ্ট হয়। মুখে দাঁত নেই। বাহুতে নেমেছে বার্ধক্য। দাঁড়ানোর শক্তি নেই। বাবার মাথায় ছিল বাহারি রঙের কেশ অথচ এখন কেশ শূন্য। স্মরণ শক্তিতেও আগের তীক্ষ্ণতার অভাব। নিজের নামও ঠিকঠাক মনে রাখতে কষ্ট হয়।

ঘরে বাবা আর আমি। কাজের লোক নেই। মফস্বলের বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া দুষ্কর। বাধ্য হয়ে রান্না ঘরে যেতে হয় আমাকে। বাবার গোসল থেকে ঔষধ খাওয়ানো এক হাতে সামলাতে হয়। পায়খানা-প্রস্রাব আমি ছাড়া কে পরিষ্কার করবে। কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই এসব সম্পন্ন করি। এ নিয়ে বন্ধুরা নাক ছিটকায়। কেউ আমার সঙ্গে মিশতে চাইত না। নিজেকে বুঝ দিতাম– বন্ধুদের ব্যস্ততা বেড়েছে। যদিও আগে অনেকের সঙ্গে কারণে-অকারণে দেখা মিলত। আড্ডা হলো বাঙালির প্রাণ। না দিতে পারলে মন খারাপ হয়ে যায়। আমিও হাঁপিয়ে উঠি। আবার মনকে সান্ত্বনা দেই। এই মুহূর্তে আমি ছাড়া বাবার কাছে দ্বিতীয় কেউ নেই। বাবাও অন্য ভাইবোনদের চেয়ে আমার সঙ্গ উপভোগ করেন।

পাঁচ ভাই, চার বোনের ছোটো আমি। বড়ো ভাই জেলা শহরের নামকরা আইনজীবী। বাবাকে দেখার সময় হাতে নেই তার। দারুণ ব্যস্ততা আইন চর্চায়। ভাবির অভিযোগ সন্তানদেরকেও সময় দেয় না ভাই। দ্বিতীয় ভাই আইটি স্কলারশিপে সপরিবারে থাকেন অস্ট্রেলিয়ায় । তা-ও প্রায় নয় বছর। বিয়ে করেছেন ওই দেশের মেয়ে। ওখানে কাজের মূল্য অনেক। বসে থাকারও সুযোগ কম। নানা ব্যস্ততার কারণে দেশের কথা ভুলেই আছেন ভাই-ভাবি। বড়ো বোন স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় স্থায়ী। পারিবারিক ব্যাবসা দেখাশোনা করেন দুলা ভাই। শ্বশুর বাড়িতে একগাল কুলি ফেলার সময় কম। দ্বিতীয় বোনের স্বামী উপজেলা শহরের পৌর মেয়র। মানুষের অভাব-অভিযোগের বিচার আচার রাজনীতি নিয়ে থাকতে হয় তার। নগর পিতাকে যোগ্য সঙ্গ দিতে হয় নগর মাতার। এত কাছে থাকার পরও আসার সময় থাকে না। তৃতীয় ভাই ইসলামিক স্কলার। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পাস। দেশ-বিদেশে ওয়াজ মাহফিল করে মানুষকে হেদায়েতের বাণী শোনায়। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে একটি বড়ো মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম। পর্দানশীল স্ত্রী পর পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে ভাইয়ের নিষেধ আছে। এমনকি শ্বশুরের খেদমতও করা যাবে না।

আমার বড়ো ভাই মেডিকেল ডিগ্রি নিতে লন্ডন গেছেন বছর তিনেক আগে। সেখানে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। হবু ভাবি বাংলাদেশি মেয়ে। পরিবারের সঙ্গে সেখানে থাকেন। বিয়ের পর স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছে ভাইয়ের। বাংলাদেশ ভালো লাগেনি। এখানে বসবাসের সুন্দর পরিবেশ নেই। একজন আরেকজনের পেছনে লেগে থাকে। ধান্ধাবাজির পেছন ঘুরঘুর করে। কে কার ক্ষতি করবে সেই ফন্দি আঁটে। আবার মেধাবী ও যোগ্যদের মূল্যায়ন করা হয়নি ঠিক মতো। আবেগে ভরপুর জাতি। অযোগ্যদের জন্যেই বাংলাদেশ। চাষাভূষা আর কৃষকের দেশ এটা। এসব ভাইয়ের একান্ত ভাবনা। তাঁর সিদ্ধান্ত দেশে ফিরবেন না। তৃতীয় বোন ও ভগ্নিপতি দুই জনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার। ফুটফুটে একটি মেয়ে সন্তানের জননী। আমাকে পছন্দ করে। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে গিয়ে নানার সঙ্গেও কথা বলতে চায়। সে জানে না এসবের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই নানার। একদম ছোটো বোন বিসিএসের প্রশাসন ক্যাডার। কয়েকদিন পরপর তার অফিস বদলি হয়। সেই সুবাধে পালটাতে হয় বাসা-বাড়ি। ছেলেটা জন্ম থেকেই বধির। দেখাশোনার জন্যে লোক রেখেছেন একজন। চিকিৎসা করতে কয়েক বার দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছে। সুস্থ আর হয়ে ওঠেনি।

২

বিশ্ববিদ্যালয় পাস করেও দীর্ঘদিন বেকার আমি। চুপচাপ দেখছি, এ নিয়ে কারো উদ্বিগ্নতা নেই। এমনকি কেউ ভাবছেও না। সৌজন্যতা দেখিয়েও কেউ কিছু বলেনি। মাঝে মধ্যে আশপাশের মানুষ ও পৃথিবী নিয়ে বিস্মিত হই। কেউ কেউ জানতে চায়, কেন চাকরি করছি না? আবার কারো কারো ধারণা একাডেমিক রেজাল্ট ভালো নয়। নয়ত ঢাকায় ঠিকঠাক লেখাপড়া করিনি। চাকরি না হওয়ার অন্য কোনো কারণ নেই। চাকরির জন্যে যে চেষ্টা করিনি এমন নয়। হয় না। নিজের হীনমন্যতা বাড়তে থাকে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায়। অথচ পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে সরকারি স্কলারশিপ পেয়েছি। এসএসসি ও এইচএসসিতে গোল্ডেন এ প্লাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে অনার্সসহ মাস্টার্স। সেই আমি চাকরি না করাটা মানুষের কাছে যেমন অবিশ্বাসের ঠেকে, নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য লাগে। যখনই বাবাকে বলতাম আমার চাকরি হচ্ছে না কেন? বলতেন– একদিন হবে। রোজ রোজ বাবার এমন কথা শুনে বিরক্ত লাগত। জানি না সেই একদিন আর কবে! আবার এটাও ভাবি, চাকরি হয়ে গেলে কে বাবার দেখাশোনা করবে? কার আশ্রয়ে রাখব? তখন মনে হয়, চাকরি না হওয়াটা আরো ভালো।

প্রেমিকার নাম গুলবদন। ফোনালাপ হলেই জানতে চায়, কবে বিয়ে করছি। অথচ এর সঠিক জবাব আমার কাছে নেই। এ নিয়ে কোনোদিন ঝগড়া থামেনি বরং বেড়েছে। লেখাপড়া শেষ করে হ্যান্ডসাম সেলারিতে কর্পোরেট চাকরি করছে সে। তা-ও তিন বছর। বউ চাকরি করবে আমি বেকার বসে খাব এমন ছেলে আমি না। চাকরি হলে তারপরই বিয়ের পিঁড়িতে বসব। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি। গুলবদনও চেষ্টা করছে আমার চাকরির জন্যে। হচ্ছে না। এক চাকরি হচ্ছে না তার উপর পরিবারের চাওয়া ছোটোখাটো চাকরি করা যাবে না। পরিবারের সম্মানে লাগবে।

প্রেমিকার বিয়ে প্রতিদিনই হয়– এমনটা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। সেই রাখাল ছেলে আর জঙ্গলের বাঘের গল্পের মতো, সত্যি সত্যি একদিন বাঘ এসে রাখাল ছেলেকে খেয়ে ফেলবে। গুলবদন বিয়ে করে স্বামীর সংসার শুরু করবে। বছর শেষে জন্ম নেবে ফুটফুটে সন্তান। এভাবে কতদিন একজনকে স্বপ্ন দেখিয়ে থামিয়ে রাখা যায়? আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতেও পারছে না গুলবদন। এটা তার দোষ নয়। তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছি আমি। ভাবাতে বাধ্য করেছি। স্বাভাবিকভাবেই অন্য কাউকে ভাবতে পারছে না সে। গুলবদন অন্য কোথাও বিয়ে করলে আমি নিঃসঙ্গই থেকে যাব। গুলবদন এজন্যেই অপেক্ষা করছে। কিন্তু একটা মেয়ে কতদিন অপেক্ষা করবে সেটাও ভাবছি। এমন অনেক ভাবনা আমাকে উন্মাদ হতে সাহায্য করবে।

৩

মুহতামিম ভাইয়ের দুই ছেলেকে পছন্দ করেন বাবা। তারাও বাবাকে পছন্দ করে। মাঝে মধ্যে বেড়াতে এসে সালাম দিয়ে বাবার কাছে বসে, ইহকাল, পরকাল, নামাজ, রোজা, আহকাম-আরকান প্রসঙ্গে কথা বলে। বাবা খুশি হন। তারা আরবি পড়ুয়া বলেই যে বাবা খুশি তা নয়, আরেকটা কারণ, তারা বাংলায় কথা বলে। খুশিতে চোখে পানি ঝরে বাবার। অন্য ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে। বাংলা উচ্চারণ পারে না বলা যায়। অথচ অন্য ভাষায় কথা বলা বাবার অপছন্দ। তাই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় পড়তে বাধ্য করেছেন। বাবার কথা পৃথিবীতে একমাত্র আমরাই ভাষার জন্যে রক্ত দিয়েছি। মিছিল করেছি। ভাষা আন্দোলনে বাবার গায়ে গুলি লেগেছিল। সেই ক্ষত এখনো তাজা। যাকে রক্ত দিয়ে অর্জন করেছি তাকে অন্যের প্রেমে পড়ে বর্জন করব না! এমন ইতিহাস কেন অস্বীকার করব। যখন যে ভাষার প্রয়োজন তখন সেই ভাষা ব্যবহার করব। কিন্তু নিজেরটাকে চিরতরে বাদ দিয়ে নয়। ভাইবোনের ছেলেমেয়ে মোট তেরো জন। এগারোজনই কথা বলে ইংরেজিতে। এমনটা বাবার অপছন্দ। বাংলা ভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষার চর্চা করা যেতে পারে। বাঙালি হয়ে অন্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা চর্চাটা একেবারে বেমানান। তারা জানে না ঠাকুরমার ঝুলি কী? লেখক কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিসের জন্যে নোবেল পেয়েছেন? তিনি কোন ভাষার কবি? কাজী নজরুল ইসলাম কোন ভাষার জাতীয় কবি? এমন ছেলেমেয়েরা হয়ত পটরপটর ইংরেজি বলতে পারবে, প্রাণ খুলে বাংলা বলতে পারবে না। নব্বই শতাংশ কৃষকের দেশে পটরপটর ইংরেজি বলা মানুষকে কেউ পছন্দ করবে না। করলেও দূরত্ব বজায় রেখে চলে। জানা সম্ভবও না। কারণ, ইংরেজি বাংলার মতোই একটি ভাষা। ইংরেজরা প্রভূত্ব সব দেশের উপর চাপিয়েছে। বাংলাকে আমরা রক্ত দিয়ে অর্জন করেছি।

বেকারত্বের ফলে নিজের উপর এক ধরনের অবসাদ নেমে এসেছে। অবসাদ কাটাতে বাড়ির পাশের কিন্ডারগার্টেনে বাংলার ক্লাস নেই। ছাত্রছাত্রীরা আমাকে পেয়ে খুশি। তাদেরকে বাংলা ভাষার গুরুত্বের প্রসঙ্গ বলি। বিশুদ্ধভাবে বলতে ও লিখতে চেষ্টা করে তারা। আঞ্চলিকতা পরিহার না করতে বলি। এটি ভাষার অলংকার। সৌন্দর্য। আঞ্চলিক ভাষায় নতুন নতুন শব্দের সন্ধান মিলে। আমার সামান্য কাজে বাবাকে খুশি খুশি লাগে। ভাষা নিয়ে আগ বাড়িয়ে কথা বলেন। বাংলা ভাষার অগ্রগতি কতটুকু শুনতে চান। সেই থেকে আমরা বন্ধুর মতো বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠি। মৃদু-মন্দ পক্ষ-বিপক্ষ বা তর্ক-বিতর্ক হয়। যদিও এর সবটুকুই মধুর। বাবা রেগে গেলেও আমি সহজ করে ফেলি। তখন বাবা বলেন, তুমি শিক্ষক হিসেবে যোগ্য।

অনেকদিন পর খেয়াল করলাম বন্ধু-বান্ধব ছাড়া দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারছি। বাবার মতো বন্ধু পেলে অন্যদের প্রয়োজন কমে আসে। এই বয়সেও বাবা অনেক আধুনিক। ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দেন। জানতে চান আমার প্রেমিকা গুলবদনের কথা। গুলবদন একাধিকবার এসে বাবাকে দেখে গেছে। মায়ের সঙ্গে প্রথম দেখার স্মৃতিচারণ করেন বাবা। বাবার জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা। সেসব বলতে থাকেন। আমিও মুগ্ধ পাঠকের মতো শুনি। সেলজুক সাম্রাজ্য থেকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাস, আমেরিকার উত্থান পর্ব ও আধিপত্যের কাহিনি, ইউরোপ যেভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, সেসবও বলেন। মোগল সাম্রাজ্য যতটা না অন্যের তারচেয়েও বেশি নিজেদের কারণে পতন ঘটেছে। এরই পরম্পরাই জানতে পারি সাতচল্লিশের ভারত-পাকিস্তান। একাত্তরে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হওয়ার ঘটনা। চাকরি প্রার্থীর জন্যে বিষয়গুলো উপকারী। বাবার মস্তিষ্ক আগের মতো তীব্র ও তীক্ষ্ণ হচ্ছে ভেবে ভালো লাগছে। দেখলাম বন্ধুত্ব নির্দিষ্ট বয়সের কোনো মানুষের সঙ্গে নয়। একজন জানাশোনা মানুষের সঙ্গে। বাবা ঠিক তাই।

দ্বিতীয় বোন উপজেলায় থাকেন। মাঝে মধ্যে বাড়িতে ঢুঁ মারেন। আমাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে পরামর্শে বসেন। কেন চাকরি করছি না। বিয়ে করে সংসার করছি না। আরো কত কী। দ্বিতীয় বোনের উপর খুশি আমি। কারণ, বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন। একদিন বাবাকে বলেন, ও কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকতা করে- কীভাবে চলবে? বিশ্ববিদ্যালয় পাস একটি ছেলে কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকতা করলে সম্মান থাকে? সমাজে মুখ দেখাতে পারব? চাকরি না পেলে প্রয়োজনে বেকার থাকবে। জমিজামা চাষ অথবা বিক্রি করে খাবে।

আপার কথায় হাসি পেল। চলে যাওয়ার সময় কড়া কণ্ঠে বলে গেলেন, কিন্ডারগার্টেনের চাকরি ছেড়ে দেই যেন। বেকার থাকার চেয়ে কিছু করা ভালো। কিছু করতে গিয়ে কারো মনে আঘাত লাগাটা বেদনাদায়ক। বুঝতে পারছি না, বাচ্চাদের পড়ালে সম্মান কীভাবে যায়! বাচ্চাদের পড়াতে ভালো লাগে আমার। ওরা শিখতে চায়। আমিও শেখাতে চাই। এটা ভালো পারি আমি। আপার সিদ্ধান্ত অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। বাবা এ বিষয়ে আপাকে কিছু না বললেও আমাকে ডেকে বললেন স্কুলে নিয়মিত যাও। ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে পড়তে চায় তা রপ্ত করো।

প্রতিদিনের মতো বাবার সঙ্গে আলাপ-আড্ডায় আবার মেতে উঠি। বড়ো আপার ফোন। বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করেন বাবা। আপা কথা বলবেন। বাবার অস্পষ্ট কথাগুলো আপার বুঝতে সমস্যা হয়। অনুমানে বুঝতে পারছি, বাবা কিছুতেই জমি বিক্রি করতে রাজি না। বলছেন, দেখ, একদিন সবাই এই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিবে। তখন আমাকে স্মরণ করবে। প্রতিটি ধূলিবালি সাক্ষ্য দিবে আমার কষ্ট ও মেহনতে নির্মিত বাড়ির কথা। এটা হবে ঐক্যের প্রতীক। নষ্ট করা ঠিক হবে

না। কেউ করতে চাইলেও ঠেকানো উচিত।

বাবা কখনো বলেনি তুমি কিন্ডারগার্টেনে থাক। অথবা চাকরি খুঁজে নাও। একদিন মেজো বোনের কথার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমি চাই না সব ছেলেমেয়ে চাকরি করুক। কেউ অন্তত বৃদ্ধ বয়সে আমার বিছানার পাশে থাকুক। গল্প করুক। আমার মাথায় হাত রাখুক। প্রয়োজনটা জেনে সহায়তা করুক। অভিজ্ঞতায় সে সমৃদ্ধ হোক। মৃত্যুর সময় পানির গ্লাস তুলে পিপাসা মিটাক। টাকা উপার্জন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া ঠিক নয়। পৃথিবীতে মানুষ মানুষের জন্যে। সন্তান কেন বাবা-মায়ের জন্যে হবে না?

বাবার ইচ্ছে পূরণের জন্যে বাবা চায়নি চাকরি করি। আমাকে নিয়ে পরিবারের সবাই উদ্বিগ্ন থাকলেও বাবাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি। এরপর বাবার প্রতি কিছুটা অভিমান বাড়ে। তুলনামূলক কথা বলি কম। কমে গেছে আড্ডা। যেখানে প্রাণ নেই সেখানে আড্ডা জমে না। বাবা কাছে ডেকে কথা বললেও প্রয়োজন ছাড়া তেমন কিছু বলিনি। অসুস্থ কিনা জানতে চান। সংক্ষিপ্তভাবে বলি, ঠিক আছি। তিনি আমাকে মায়ের কথা বলেন। শৈশবের কথা বলেন। জানি, বাবা আমাকে হাসাতে চান। কেন জানি বাবার সঙ্গে বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারি না। তাছাড়া রাগ করেও লাভ নেই। মাস ছয়েক আগে সরকার নির্ধারিত চাকরির বয়স অতিক্রম করেছি। এই কারণেও আমার মন খারাপ থাকে। কিছু আবেদন করা আছে। সেগুলোই শেষ ভরসা। না হয় এই কিন্ডারগার্টেনেই থাকতে হবে। বাদ দিতে হবে গুলবদনের প্রেম ও ভালোবাসা।

৪

বাবা আগের চেয়ে বেশি অসুস্থ। খাওয়া-দাওয়া এক প্রকার বন্ধ। কথাও বলছেন না। বাবা কথা না বললে সব কিছু অসহ্য লাগে। ডাক্তার ভরসা রাখতে পারছেন না। একই সময় আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন মেজো আপা। জমি বিক্রি করে ব্যাংকে এফডিআর করতে বলেন। এরপর বিয়ে করতে হবে। ব্যাবসাবাণিজ্য নিয়েও ভাবতে হবে। ভাগের অতিরিক্ত টাকা শখে ভাইবোনরা বণ্টন নিতে চায়। সিরিয়াস আলোচনা চলছে। এক ফাঁকে বাবা চোখ মেলে তাকান। আবার চোখ বুঝেন। কিছুক্ষণ পর আবারো তাকান। সবাই তখন নীরব। বাবার দিকে তাকিয়ে আছি আমরা। হয়ত শেষ নসিহত করবেন ছেলেমেয়েদের। চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করেন বাবা। কাছে বসে চোখের পানি মুছে দেই। আবার চোখ বুজেন বাবা। উদ্বিগ্নতা বাড়ছে আমাদের। আমি চাই বাবা বেঁচে থাকুক। বাবার খেদমত করতে চাই। বাকি জীবন বাবার সেবা করে কাটিয়ে দেব। যে হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন আমাকে, এটা অন্তত বুঝি। না হয় কেন আমাকে কাছে রাখতে চাইবেন। তাছাড়া বাবাকে ছাড়া এখন ভালোও লাগে না। এখনো অনেক কিছু জানার আছে। প্রয়োজনে চাকরি করব না। ক্যারিয়ার লাগবে না। বাবা বেঁচে থাকুক। খাদেম হিসেবে থাকতে চাই আমি।

ঘণ্টাখানেক পর চোখ মেলেন বাবা। কাছে ডাকেন। কান্না কণ্ঠে বলেন, তোমাকে ঠকিয়েছি এমনটা মনে করো না। যেদিন আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব সেদিন তোমার চাকরি হবে। এর আগে না। আমার স্থায়ী-অস্থায়ী জায়গা-জমির বর্তমান বাজার দামটা হিসাব করো। প্রথম শ্রেণির একজন অফিসারের সমান বেতন ব্যাংকে এফডিআরে জমা আছে। ওটা তোমার নামে। উপস্থিত ভাইবোনের চোখ বড়ো হয়ে গেল! বাবা এত কিছু ভেবে রেখেছেন! সবাই টাকা নিতে অস্বীকার করল। বাবা বলেন, এই টাকায় তোমাদের কাছ থেকে বাড়িটি কিনে নিলাম। জীবনের পড়ন্ত বেলায় মুক্ত পরিবেশে আমার আশ্রয়ে কেউ এসে মাথা রাখবে। বাড়ি আমার নামে থাকবে।

বাবা প্রায় প্রতিদিনই যায় যায় অবস্থায়। বাড়িতে রোজ মানুষ আসে। আমার উপর কিছুটা চাপ কম, সেই ফাঁকে কিন্ডারগার্টেনে বাচ্চাদের পড়াতে যাই। বাচ্চাদেরকে ভালোবেসে ফেলেছি। তারাও আমাকে ভালোবেসেছে। যেই বন্ধন ত্যাগ করা কঠিন। বাবা একবার চেয়েছেন আমি কিন্ডারগার্টেনে আসি। ভাবছি কিছুদিন পর স্কুলের সঙ্গে কথা পাকাপাকি করব। বাবার ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়ে তাদেরকে বাংলাটা ভালোভাবে শেখাব। ভাষার বীজ ছোটো বাচ্চাদের অন্তরে রোপণ করব। যেন বড়ো হয়ে সমস্ত পৃথিবীতে বাংলা ভাষার ফেরিওয়ালা হতে পারে। ভাইবোনদের ঘৃণা আমার উপর দিন দিন বাড়তে থাকে। কেন আমি এমন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি! তারা কিছুতেই আমাকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেবেন না। বাবা ছিলেন বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলনে সামনের সারির কর্মী। চোখের সামনে পুলিশের গুলিতে জীবন বিসর্জন দিয়েছে বন্ধুরা। আহত ও নিহত বন্ধুদের হাসপাতালে নিয়েও জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তখনই বাবার পণ ছিল বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাকে যে কোনো উপায়ে তুলে ধরবেন।

বাবা সংকটাপন্ন অবস্থায়। যে-কোনো মুহূর্তে পড়তে হবে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইল্লাইহি রাজিউন। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে নিতে পারিনি। বাবার থেকে নিষেধাজ্ঞা আছে। আমার মোবাইল বেজে উঠল। গুলবদনের ফোন। বাবার খবর জানতে চায়। এরপর আমার। বাবার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে সে।

ইশারায় কাছে ডাকেন বাবা। বাকিদের বের হতে বলেন। বাবার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। পানি মুছে দেই। শ্বাস একবার বাড়ে, একবার কমে। হাত-পায়ে নিস্তেজতা। আমার ভেতরে কম্পন বাড়ছে! আমার হাতের উপর বাবার মাথা। তাকিয়ে আছেন। চোখ নড়ছে না। চোখ বুজিয়ে দেই। এরপর আর চোখ মেলেননি। অথচ বাবা আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

বাড়িজুড়ে ভয়ংকর নিস্তব্ধতা! কান্না শব্দে বাড়িটি হয়ে গেছে বিষাদের বাগান। কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। ভেতরে ভেতরে সমুদ্রের দুই পাড়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে। প্রবল উত্তাল সেই ঢেউ। দর্শক হয়ে দেখছি আর অশ্রু বিসর্জন করছি।

বাবার মৃত্যুর খবর শুনে দূর-দূরান্ত থেকে জানাজায় মানুষের সমাগম বাড়ে। অধিকাংশই অচেনা। সামাজিক নিয়ম মেনে চতুর্থ দিনে আয়োজন করা হয় দোয়ার অনুষ্ঠান। কয়েকজন অপরিচিত মেহমানের উপস্থিতি দেখা মিলে। একজন ইশারায় কাছে ডাকেন। নাম জানতে চান, তাকে বলি, নাহিদ।

বলেন, তোমার বাবা যখন সরকারের আমলা ছিলেন তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ ছিলাম। বয়সে সিনিয়র হলেও আমরা বন্ধুর মতো। সংসার ও সংগ্রামী জীবনের অজানা অনেক কথা বলতেন। ভাষা সংগ্রাম ও ভাষার প্রতি তাঁর ছিল সীমাহীন প্রেম। চাইতেন অন্তত এক সন্তান শেষ বয়সে পাশে থাকুক। বাংলা ভাষায় চর্চা করুক। গবেষণার মাধ্যমে ভাষাকে সমৃদ্ধ করুক। তারজন্যে সব ব্যবস্থাও করে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনো উপহার দিতে চাইলে সেটি গ্রহণ না করে বলতেন, খুশি হব ছোটো ছেলের জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করলে। এই হলো চাকরির কাগজপত্র। দ্রুত যোগদান করো। স্বাগতম।

তিনটি অক্ষর

আ. শ. ম. বাবর আলী

একটি বর্ণমালার মাত্র তিনটি অক্ষর দিয়ে
লেখা যায়
সবচেয়ে সুন্দর একটি ফুলের নাম ।
তিনটি অক্ষর দিয়ে লেখা যায়
আকাশ ছোঁয়া দীর্ঘ একটি দেবদারু বৃক্ষের নাম।
লেখা যায় সুউচ্চ একটি
পর্বতের নাম।
একটি বর্ণমালার মাত্র তিনটি অক্ষর দিয়ে
লেখা যায়
অনন্ত সুগভীর একটা অতল সমুদ্রের নাম
দৃষ্টি জুড়ানো অসীম
আকাশের নাম।
একটি বর্ণমালার মাত্র তিনটি অক্ষর দিয়ে
লেখা যায়
কিষানের স্বপ্ন পূরণের
দিগন্তবিস্তৃত বুকভরা
ফসলের শস্যভূমির নাম।
লেখা যায়–
একটি স্বর্ণালি শতাব্দীর নাম
একটি গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের নাম
একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ভৌগোলিক বৃত্তান্ত।
বাংলা বর্ণমালার গর্বিত ধন্য তিনটি অক্ষর–
'মুজিব'।

ভাষাবৃক্ষ

স. ম. শামসুল আলম

আমাদের ধমনিতে একটি বৃক্ষ রোপিত হয়েছিল
রক্ত-জলে প্রাণ পেতে পেতে বৃক্ষটি এখন মহিরুহ
শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত
তাকে বোধিবৃক্ষ বলি আর জ্ঞানবৃক্ষ বলি
মূলত এটাকে আমরা ভাষাবৃক্ষ বলতে পারি
ভাষাবৃক্ষ জন্ম নিতে শুরুতেই
তরতাজা রক্ত ঢেলে দিতে হয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে
আজ তার সুফলও পাচ্ছি ঢের
বাহান্নতে জন্ম নেওয়া ভাষাবৃক্ষ থেকে
জন্ম নিয়েছে চুয়ান্ন
জন্ম নিয়েছে ছেষট্টি
জন্ম নিয়েছে উনসত্তর
উনসত্তর থেকে একাত্তর
একটি বৃক্ষ থেকে একটি দেশের স্বাধীনতা
আমরা পেয়েছি আমাদের ধমনিতে নতুন সঞ্চারণ
একটু একটু করে এগোতে এগোতে
নিরানব্বইতে মিলে গেল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
আমাদের ভাষাবৃক্ষ আমাদের ভাষা ছড়াতে ছড়াতে
ক্রমান্বয়ে বুনে যাচ্ছে ভালোবাসা-বীজ
ভাষা থেকে জন্ম নিচ্ছে শুধু ভালোবাসা আর ভালোবাসা।

বাংলা ভাষার রাষ্ট্র আশা

মোহাম্মদ আজহারুল হক

যখন শোনা গেল বাংলা
হবে আরবি হরফে
মনে হলো হৃদপিণ্ডটা চাপা
ঠান্ডা বরফে।
যখন শোনা গেল উর্দু
হবে রাষ্ট্রভাষা
মনে হলো হৃদপিণ্ডটা
কালো রক্তে ঠাসা।
যখন শোনা গেল বাংলা
হলো রাষ্ট্রভাষা
হৃদপিণ্ডে এল বাংলা ভাষার
রাষ্ট্র আশা।

শেকড়কথা

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

স্বাধীনতা দয়ার ছলে কেউ করেনি দান
যুদ্ধ করে আনলো কিছু গর্বিত সন্তান।
ফেব্রুয়ারির একুশ ছিল
স্বাধীনতার ভিত
ভাষার দাবির মধ্য দিয়ে
জেগেছে সম্বিৎ।
এই দাবিতে সর্বপ্রথম রক্ত ঝরে লাল
ক্ষুব্ধ জাতি হয়েছিল বিক্ষোভে উত্তাল।
আত্মত্যাগে অবশেষে অর্জিত হয় ফল
বীর বাঙালি যুদ্ধ শেষে মুক্ত প্রাণোচ্ছল।
ফেব্রুয়ারির একুশ ছিল
স্বাধীনতার মূল
এই দিবসে প্রাণে প্রাণে
তাইতো হুলুস্থুল।
স্বাধীনতার শেকড় পোঁতা ফেব্রুয়ারির মাঝে
শহিদমিনার সজ্জিত হয় ফুলের কারুকাজে।
রক্তরাঙা ফেব্রুয়ারি সাহস বাড়ায় মনে
ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করি ভাষার প্রয়োজনে।

মায়ের ভাষা আমার ভাষা

অদ্বৈত মারুত

বাংলা আমার প্রাণের ভাষা এই ভাষাটা মায়ের
এই ভাষাটা প্রতিবেশীর এই ভাষাটা ভায়ের
এই ভাষাটা বোনের এবং গাঁয়ের সকল লোকের
বাংলা আমার সুখের ভাষা দুখের এবং শোকের।
এই ভাষাতেই বলছি কথা হাজার বছর ধরে
ইতিহাসের পাতায় লেখা সোনালি অক্ষরে–
কবিতা, গান এবং নানান রীতিনীতির বাণী
ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সেসব কথা জানি।
বদ্বীপের এই দেশে–
একেক সময় একেক রাজা দখল নিতে এসে
নিপীড়ন আর বঞ্চনাতে করত জীবন নাশ
সেসব বাধা ভাঙতে সবার কাটত বারোমাস!
ব্রিটিশেরই শিকল ভেঙে পাকশাসকের গ্রাসে
বাঙালি এই জাতির মনে দুঃখ নেমে আসে।
মানুষ নামে দানব ছিল শোষণ ও শাসনে–
পাকি ছিল এই দেশেরই ক্ষমতার আসনে।
মায়ের ভাষা কাড়তে ওরা হিংস্র হয়ে ওঠে
দখল নিতে ছুড়ল গুলি কত্ত বোমা ফোটে!
'উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা' করলে হুকুম জারি
দাবির মিছিল বীরছেলেদের রক্তে হলো ভারী।
দাঁতভাঙা তার জবাব পেয়ে পেছাল ফের ওরা
বাংলা আমার প্রাণের ভাষা ভালোবাসায় মোড়া।
বাংলা মায়ের ভাষা আমার বাংলা সবার সেরা
হাজার যুগের আশার আলো স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আবুল হোসেন আজাদ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
একুশ এখন সারা বিশ্বজুড়ে,
ভোর সকালে প্রভাতফেরির মিছিল
হাতে ফুল ও মুখে গানের সুরে।
ভাষার জন্যে দামাল ছেলের দল
প্রাণটি দিল পথে অকাতরে,
রাষ্ট্রভাষা বাংলা পেলাম তাই
মাথা তুলি এখন গর্ব ভরে।
শিল্পীর হাতে রংতুলিতে আঁকা
আমার এদেশ সবুজ ছায়ায় ঘেরা,
আমার মায়ের মুখের মধুর ভাষা
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
একুশ এখন সবার অহংকার,
স্মৃতির ছায়ায় জেগে ওঠে ওরা
রফিক শফিক বরকত ও জব্বার।

আর এভাবেই জন্ম হয়

লিলি হক

দু'পায়ে ধূলিকাদা
অঘ্রানী ধানে সোনা রং
কিষানি বধূর চোখ ভরা স্বপ্ন।
উঠোনের চারধারে লেপাপোঁছা শেষ,
রাতে মলন দেওয়া হবে
ঢেঁকিঘরে ধানের স্তূপ
ব্যস্ততার ফাঁকে বুকের দুধ খাইয়ে
শিশুপুত্রকে নাওয়ানো ঘুম পাড়ানো
আরও কিছু যত্ন,
দু'হাতে ডালি ভরে ধানচাল সরিষা
কলাই দিয়ে, আরও কত কি শস্যপণ্য।
সময় এগোয়
বেড়ে ওঠা শিশুটি মায়ের আঁচল ছেড়ে
শহরে আসে,
পড়াশুনা করে অনেক বড়ো হবে
লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেটি
ভাষা আন্দোলনে যোগ দেয়,
মিছিল-মিটিং, কৃষক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী
ছাত্রসমাজ অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে
বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার্থে,
পশ্চিমা শাসকের ঘাতকগুলি ছিনিয়ে নেয়
অসংখ্য পল্লিমায়ের কলজে ছেঁড়া বুকের মানিক
আর এভাবেই জন্ম হয় মহান একুশ তোমার,
বর্ণমালার সুবাসিত বৃক্ষটি
তাই বড়ো প্রিয় আমার।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই

মুহাম্মদ ইসমাঈল

সাতচল্লিশে দেশভাগ, বাহান্নর ভাষা আন্দোলন
একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ তারপর স্বাধীনতা অর্জন
সব পরতে পরতে তোমার ছোঁয়া
তোমাদের ছোঁয়া
সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার নাম না জানা
আরো অনেকে।
তোমাদের প্রেরণায় ভাষা পেলাম
তোমাদের হিম্মতে আশা পেলাম।
তোমাদের সেই উদাত্ত আহ্বান–
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলায়
শহর হতে সুদূর গাঁয়।
তোমাদের বদৌলতে পেলাম বাংলা ভাষার স্বীকৃতি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তোমাদের জন্য প্রাপ্তি।

মা ও মাটির বিজয়
বাবুল তালুকদার

মাতৃভাষা বাংলার জন্য
বাঙালি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য
দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসে
লক্ষ কোটি মানুষ।
ঝাঁপিয়ে পড়ে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে
এদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, শহিদ হলো।
রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, সালাম
আরও কত মায়ের সন্তান শহিদ হলো দেশে প্রান্তে
রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য,
একের পর এক আন্দোলন হয়।
একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কালরাত্রি নেমে আসে
ছোবল দেয় পাকিস্তানি পাক বাহিনীর সৈন্য
আমাদের বাঙালি মুক্তিসেনারা ঝাঁপিয়ে পড়ে
যুদ্ধের ময়দানে মোকাবিলা করে।
নয়টি মাস যাযাবর বেশে এখানে-ওখানে যুদ্ধ করে
গুলিবর্ষণ হয় রাতদিন সব সময়,
যুদ্ধ হয় মহাযুদ্ধ।
জ্বলন্ত বারুদের মতো জ্বলে উঠে এদেশের মানুষ
পাকিস্তানি সেনা কোনো উপায় না পেয়ে
বাংলা ছেড়ে পালিয়ে যায়, আত্মসমর্পণ করে,
হেরে যায় আমাদের মুক্তি সেনার কাছে।
বাংলার প্রকৃতিজুড়ে বিজয়ের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে,
মা ও মাটির দেশে।
বিউগল বাজিয়ে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দেয় আকাশে
সোনার বাংলার এই মাটিতে।

শহিদমিনার
রকিবুল ইসলাম

আমাদের আছে এক শহিদমিনার
দেখতে যে সাধ জাগে ছোট্ট তিনার।
তিনা যায় মিনারে
দূরে নয়, কিনারে।
বরকত-সালামের হাসি পায় শুনতে
ওরা নাকি চেয়েছিল স্বাধীনতা বুনতে!
তিনা যায় থমকে
ভয়ে নয়, চমকে।
ভাষা পেল সম্মান শহিদের রক্তে
ফুল দেয় মিনারে তাই কোটি ভক্তে।
মিনারটা জেগে রয়
আজীবন নির্ভয়।
বরকত-সালামের রক্তের লাল দাগে
সূর্যটা বুকে নিয়ে মিনারটা কাল জাগে।

প্রেমের প্রথম বর্ণ
কামাল বারি

মা গো তোর পাশে আছি– আমি তো ছিলাম বাহান্নয়;
তোকে নিয়ে এই আমি– মা গো তোকে নিয়ে বিশ্বময়।
মা গো তোর কোলে শিখি আমি প্রেমের প্রথম বর্ণ...।
মা গো পৃথিবীর দিকে দিকে জেগে আছি এই আমি–
মা গো তোর সুকোমল হৃদয়-কুসুমে রক্তবীজে।
অই মধুমুখ মা গো– ভায়ের রক্তের লাল ঘ্রাণ;
আহা, অই মুখে ফুটে আছে আরাধ্য স্বদেশভূমি
যে অধিকারে তোমারে আমরা জাগাই ঘন চুমি;
বিশ্ব মা-কে দেখি মা গো তোমার বর্ণমালার প্রাণ।
চেতনার বীজ বুনে রেখেছি– জাগিয়ে রেখেছি 'মা';
বিনম্র শ্রদ্ধার এই মাটি– অবিনাশী বাংলার ...।

ভাষাশহিদ স্মরণে
মোঃ আহছান উল্লাহ্

আমার যা কিছু সম্বল
রফিক-সালাম-বরকত
হারিয়েছি বহুকাল
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী
ওরা সাক্ষী বাংলার।
একুশ আসে দীপ্ত রাগে
ভোরের শেফালি ফোঁটে না আর
ছেলে হারানোর ব্যথা নিয়ে বুকে
কেঁদে ফিরেছি এত কাল
ভাঙনের গান গেয়ে চলেছি
শূন্য হাতে প্রতিদান।
অশ্রু ভেজা চোখের পাতায়
ভেসে ওঠে ছবি তার।
রফিক, সালাম, বরকত দীপ্ত শপথ
গেয়ে যায় ভাষার গান।
২
বাংলা দেশের ছেলেমেয়ে
বাংলায় কথা কয়
বাংলা আমাদের মাতৃভাষা
বিশ্বে পরিচয়।
এই ভাষাতেই গর্ব আমাদের
রফিক-সালাম-বরকত
বীরের মতো যুদ্ধ করে
ঢেলে দিয়েছে রক্ত।
স্বাধীন বাংলার ধন্য ছেলেরা
স্বাধীনভাবে চলে
বিপদ আসলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
মায়ের আঁচল জড়িয়ে ধরে
সাহস বুকে ভয় করে না
ভেঙে দেয় বাধার প্রাচীর
বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলে
হুংকার দিয়ে উঠে।
বাংলা আমাদের মাতৃভূমি
বাংলা ভাষায় কথা বলি
বাংলা এখন বিশ্ব ভাষা
বিশ্বে বাংলার পরিচিতি।

এই বাংলাকে
খোরশেদ আলম নয়ন

চর্যাপদেও পেয়েছি বাংলা ভাষা
রাধা-কৃষ্ণও বাঁধা বাংলার সুরে,
বাংলা আমার এক বুক জ্বালা আশা
বাংলা আমার সারাটি হৃদয়জুড়ে।
আউল-বাউল কত যে সাধক কবি
বাংলার মোহ পথেই বেঁধেছে ঘর;
অন্তরে পুষে এই বাংলার ছবি
বিদ্রোহে আর সন্ন্যাসে মন গেঁথেছে নিরন্তর।
পার হয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী
কত ভিনদেশি বাংলার সুধা মুখে
জীবনে জীবন পার করে নিরবধি
ঘুমিয়ে রয়েছে এই বাংলার বুকে।
হাজার যুগের স্বপ্ন জুড়ানো টানে
কোটি অন্তর একই মোহনায় মেশে
কামে-প্রেমে অভিমানে আর গানে গানে
এই বাংলাকে তবু যায় ভালোবেসে।

বাতাস পালটায়
সুধীর কৈবর্ত

বাতাসও সময় সময় পালটে যায়,
বলতেই পারো, পালটি খায়;
আপন ইচ্ছেয় গতি বাড়িয়ে-কমিয়ে-
কখনো-সখনো মিলিয়ে যায়
পরশ পাওয়ারও বাইরে,
কেড়ে নেয় প্রাণের নিশ্বাস।
কখনোবা অদৃশ্য আক্রোশে
আঘাত হানে প্রবল বেগে,
উড়িয়ে-গুড়িয়ে প্রাণ কেড়ে নিয়ে
বিধ্বস্ত, তছনছ করে সারা প্রকৃতি।
আবার ফিরেও আসে, ফুরফুরে হয়ে
শান্তির পরশ বোলায় মনে ও প্রাণে
দুঃখ-কষ্টের দাপটের মধ্যেও
ক্ষণের তরে এনে দেয় সুখানুভূতি।

বাংলা আমার
চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

বাংলা আমার প্রাণের ভাষা এই ভাষাতেই হাসি,
অ আ, ক খ বর্ণমালা তাইতো ভালোবাসি
এই ভাষাতেই ছড়া লিখি,
মায়ের মুখের ভাষা শিখি
বাংলা আমার হৃদয়জুড়ে আকুল করা গান,
ভাষার প্রতি দেশের প্রতি তাইতো এত টান।
এই ভাষাতেই কিচিরমিচির পাখির ডাকাডাকি,
রংতুলিতে ইচ্ছেমতো কত্ত ছবি আঁকি।
আনতে ভাষা রক্ত গেল কত,
করল প্রমাণ জীবন দিয়ে শ্রদ্ধা ছিল যত।
বাংলা ভাষা পেলাম ফিরে,
চোখের পাতায় বর্ণমালা আজও আছে তাইতে ঘিরে।

একুশে ফেব্রুয়ারি
সাহিদা খাতুন

সাঁঝের আকাশ কোথা হতে পেল
অমন রক্ত রং
শহিদের তাজা খুন হতে সেকি
পেয়েছে রাঙা রং।
পুত্রহারা মায়ের বুকে
ব্যথার আগুন জ্বলে
সেথা হতে আকাশ পেয়েছে কি আজ
অমন রক্ত রং।
দু'দিন আগে হয়েছে মাত্র
আদুরে কন্যার বিয়ে
মুখের লজ্জা ঘোচেনি এখনো
মোছেনি মেহেদি রং।
লাজ খসে যায়, আঁখি হতে ঝরে
কলিজার লাল খুন,
সেথা হতে পরেছে কি আজ
সাঁঝের আকাশ রং।

এইসব গল্প
মনির জামান

গল্প নিছক গল্প নয়
গল্পে থাকে সত্যের নির্যাস।
এইসব পাতাবাহারও
একদিন শিকরবিহীন বাকলেই
বিস্তার করবে বংশ।
ঘুমন্ত পাহাড়গুলো জেগে উঠে
শিশুশিক্ষার জটিল যুক্তবর্ণ জোড়া দিয়ে
পাঠ করবে দুশো ছয়খানা হাড়।
জমানো পরাগ রোদের শরীরে রেখে
সূর্যস্নানে নামবে ঝরনা।
টুকরো হওয়া পাথরে লিখে পাখির নাম
পথ হাঁটবে পশ্চিমে
গোধূলি রাঙাচঞ্চু তৃষ্ণার্ত উড়ে যাবে অসীমে,
আর উদাস-উদার বৃক্ষের বাকলে
গ্রথিত হবে জীবন-জগৎ
আলো-আঁধারের গল্পেরা।
সিন্ধু থেকে উড়ে আসা বিন্দু জল
যখন বৌচি খেলছে সবুজ পাতায়
তখন গল্পের তাজিয়া মুহূর্তে
সপ্ত-সাগর-আসমান, তেরো নদী, হেরা গুহা
ঘুরিয়ে এনে বলবে, দেখলে তো
মানব জন্মের ইতিহাস কত সংক্ষিপ্ত!
নক্ষত্রের উঠোনে এইসব সত্যাশ্রয়ী গল্প
দ্যুতি ছড়াবে আরও কিছুকাল।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৮ই জানুয়ারি জাতীয় সংসদের ২০২১ সালের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদ দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জাতীয় সংসদ দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। গণতন্ত্রায়ণ, সুশাসন ও নিরবচ্ছিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়নে সব রাজনৈতিক দল, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে ঐকমত্য গড়ে তোলার সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমি ঔদাত্ত আহ্বান জানাই। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন সুসংহতকরণ এবং জাতির অগ্রযাত্রায় সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলকেও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। ১৮ই জানুয়ারি একাদশ জাতীয় সংসদের ২০২১ সালের প্রথম ও শীতকালীন অধিবেশন ভাষণে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রা বেগবান করতে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সুশাসন সুসংহতকরণ, গণতন্ত্র চর্চা ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে দেশ থেকে দুর্নীতি, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের লক্ষ্যে আমাদের আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আসুন, দল-মত-পথের পার্থক্য ভুলে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমরা লাখো শহিদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করি।

আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালে বিশ্বসভায় একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়া। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা একটি কল্যাণমূলক, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সক্ষম হব।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় ফোর্সেস গোল ২০৩০-এর আলোকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরের ১৭টি ইউনিট গঠন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যানবাহন ও আধুনিক সরঞ্জাম সংযোজিত হয়েছে। দুটি সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে নৌবাহিনী আজ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে আধুনিক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিমান, হেলিকপ্টার, রাডার, অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে গত বছরের ৩১শে আগস্ট প্রথম স্থান পুনরুদ্ধার করেছে। বর্তমানে সাতটি দেশের সাতটি মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী এবং পুলিশের মোট ৬ হাজার ৮৬৫ জন শান্তিরক্ষী শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা ঘটে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা ঘটে। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদান ছিল অতুলনীয়। ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালের জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সবই হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলার রূপকার। ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বাণীতে বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধু সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন খাতে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জানুয়ারি ২০২১ সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে ৩৭তম বিসিএস-পুলিশ ব্যাচের শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ ভার্চুয়ালি প্রত্যক্ষ করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

তিন বিষয়ে গুরুত্ব দিতে পুলিশকে নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জানুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে ৩৭তম বিসিএস পুলিশ ব্যাচের শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'তোমরা জনগণের পুলিশ' বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেন এবং পুলিশ বাহিনীকে জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি এ বাহিনীকে শৃঙ্খলা, সততা, পেশাদারিত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে চলার, সবসময় দেশের মানুষের পাশে থাকার এবং মানুষের সেবা করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। গতানুগতিক অপরাধের পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, মানব পাচার, জঙ্গিবাদ, মাদক, সন্ত্রাস, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা-নির্যাতনসহ নিত্যনতুন সামাজিক অপরাধকে আরো দক্ষতার সাথে দমন করার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং পুলিশে পৃথক একটি মেডিক্যাল ইউনিট গঠন করা জরুরি বলে মনে করেন। তাছাড়া ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলাগুলোতে পুলিশ হাসপাতালগুলোর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

অভিবাসী কর্মীদের বিষয়ে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই জানুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অভিবাসী কর্মীদের নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে এসব বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেন। বিদেশে কর্মী পাঠানোয় সম্পৃক্তদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা, প্রবাসীদের কর্মসংস্থান ঠিকমতো হচ্ছে কি-না, কর্মস্থলের নিরাপত্তা, বিশেষ করে নারী কর্মীদের নিরাপত্তা বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের লক্ষ রাখার নির্দেশ দেন। তিনি কাজের জন্য অন্ধের মতো বিদেশে যাওয়ার জন্য না ছুটে ভালোভাবে খোঁজখবর নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণ ছাড়া সার্টিফিকেট না নিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সার্টিফিকেট নিয়ে বিদেশ যাওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রী ইমরান আহমদ প্রবাসী বাংলাদেশিদের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তির চেক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে সিআইপি ক্রেস্ট এবং সনদ বিতরণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এবং শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বিজয়ের ইতিহাস প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং শিশুরা যাতে আগামীর জন্য নিজেদের তৈরি করতে পারে সে লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুতোষ এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে দেখা যায় এমন ছবি নির্মাণ করার জন্য চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি চলচ্চিত্র শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সম্ভব সবকিছু করার আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২০১৯ সালে ২৬টি ক্যাটাগরিতে ৩৩জন শিল্পী এবং কলাকুশলীকে পুরস্কৃত করা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী চলচ্চিত্র শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণের ৪৯ বছর পূর্তি দিবসে কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশন প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন–পিআইডি

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

রক্তার্জিত স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় ১০ই জানুয়ারি

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পায় দেশের রক্তার্জিত স্বাধীনতা। ৯ই জানুয়ারি রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আওয়ামী হকার্স লীগ আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। সেই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের মধ্যেও বাঙালির মনের গভীরে একটি কালো দাগ ছিল– বঙ্গবন্ধু কখন আসবেন। দেশের রক্তার্জিত স্বাধীনতা সেদিনই পূর্ণতা পেয়েছিল, যেদিন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ই জানুয়ারি বাংলাদেশে পদার্পণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাজার বছরের ঘুমন্ত বাঙালিকে স্লোগান শিখিয়েছিলেন– 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'; আর সেই স্লোগানে উদ্দীপ্ত লাখ লাখ বাঙালি বুকের তাজা রক্ত ঢেলে সেই রক্তিম স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী।

১০ই জানুয়ারি দেশের মাটিতে পদার্পণ করে বঙ্গবন্ধু পরিবারের কাছে যাননি, বিমানবন্দর থেকে ছুটে গেছেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আনন্দাশ্রুসজল নয়নে জাতির পিতাকে এক পলক দেখার জন্য উন্মুখ লাখ লাখ মানুষের কাছে। সেই আনন্দে বিহ্বল জনতার সমুদ্রকে তিনি বলেছিলেন– দেশের মানুষেরা দেশকে স্বাধীন করেছে, তাঁকে মুক্ত করে এনেছে, তাঁদের রক্তের ঋণ তিনি বুকের রক্ত দিয়ে শোধ করতে প্রস্তুত। সেদিন কেউ ভাবেনি পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট তাঁকে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ৭ দশমিক ৪ শতাংশের রেকর্ড বঙ্গবন্ধু করে গিয়েছিলেন, চল্লিশ বছর পরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতি তা অতিক্রম করতে পেরেছে বলে মনে করেন তথ্যমন্ত্রী।

জঙ্গিবাদ-মৌলবাদকে রুখতে সহায়ক হবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা

জঙ্গিবাদ-মৌলবাদ রুখতে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ৯ই জানুয়ারি রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে ডিরেক্টরস গিল্ডের দ্বিবার্ষিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের আত্মিক উন্নয়ন ঘটাতে চায়, কারণ উন্নত জাতি গঠনে এর বিকল্প নেই। তিনি এ সময় নাটক, চলচ্চিত্রসহ সংস্কৃতির সকল অঙ্গনে দেশের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে লালনে যত্নবান থাকতে সৃষ্টিশীলদের প্রতি আহ্বান জানান।

ডিরেক্টরস গিল্ডের সভাপতি সালাহউদ্দীন লাভলুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এ হক অলীকের সঞ্চালনায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্রটি হবে ঐতিহাসিক দলিল

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্রটি আমাদের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে এবং ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ১২ই জানুয়ারি রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এ চলচ্চিত্রের জন্য নির্বাচিত শিল্পী ও কুশলীদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব খাজা মিয়া ও তথ্য কমিশনার আবদুল মালেক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী এ সময় বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্রের শিল্পী ও কুশলীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান ও তাদের অংশগ্রহণের সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করে বলেন, তথ্য মন্ত্রণালয় সবসময় তাদের সাথে রয়েছে। ঠিক এক বছর আগে ২০২০ সালের ১৪ই জানুয়ারি ভারতের নয়াদিল্লিতে তাঁর ও ভারতের তথ্যমন্ত্রী প্রকাশ জাভাদকারের উপস্থিতিতে দুদেশের চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের মধ্যে এই চলচ্চিত্রটি যৌথভাবে নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরের কথাও স্মরণ করেন তথ্যমন্ত্রী। উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এবং প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান তাদের বক্তব্যে এ চলচ্চিত্রকে দেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ ৬ই জানুয়ারি ২০২১ 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০২০' উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের কৃতি সন্তানদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দেন–পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

একনেকে ৬ প্রকল্পের অনুমোদন

৫ই জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি পদ্ধতিতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী তিনটি সংশোধিত ও তিনটি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন দেন।

অভিবাসী কর্মীদের নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ

৬ই জানুয়ারি: আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

৭ই জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

১০ই জানুয়ারি: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ নিজ দেশে ফেরেন। বাঙালিরা এ দিনটিকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালন করে। বিশেষ এই দিনটিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেন।

মোবাইলে ভাতা প্রদান কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

১৪ই জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র মিলনায়তনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান থেকে দেশের প্রায় এক কোটি অসহায় মানুষের কাছে ডিজিটাল অ্যাকাউন্টের মাধমে মোবাইলে দেওয়া হয় ভাতার টাকা।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯

১৭ই জানুয়ারি: ঢাকার আগারগাঁওয়ের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে হল অব ফেম মিলনায়তনে বসেছিল জাতীয় চলচ্চিত্রের আসর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের 'আর্ন্তজাতিক সেমিনার' উদ্‌বোধন

২১শে জানুয়ারি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের 'আন্তর্জাতিক সেমিনার' উদ্‌বোধন করা হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন।

মুজিব শতবর্ষে গৃহহীনদের প্রধানমন্ত্রীর উপহার

২৩শে জানুয়ারি: মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে ৬৯ হাজার ৯০৪টি পরিবারকে পাকাঘর বিতরণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জলবায়ু অভিযোজন সামিট ২০২১

২৭শে জানুয়ারি: নেদারল্যান্ডস সরকারের উদ্যোগে ২৫ ও ২৬শে জানুয়ারি দুদিনের অনলাইন জলবায়ু অভিযোজন সামিট ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অংশগ্রহণ করেন।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচির উদ্‌বোধন

গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি টিকাদান কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন।

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ

৩০শে জানুয়ারি: এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে সারা দেশে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৯টি সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ফলাফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। এ বছর জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৬১,৮০৭ জন।

প্রতিবেদন: শরিফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিসংঘে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থান

স্বল্পোন্নত (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটাতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভলপমেন্ট পলিসি'র (সিডিপি) ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় গ্র্যাজুয়েশনের মানদণ্ড পূরণ ও উত্তরণে চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করবে বাংলাদেশ। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাবে। ১২ই জানুয়ারি সিডিপির এলডিসি উত্তরণ সংক্রান্ত ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আয়োজিত এক্সপার্ট গ্রুপের বৈঠকে বাংলাদেশের অবস্থান

তুলে ধরা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) জুয়েনা আজিজ। বৈঠকে একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পক্ষে বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থান তুলে ধরেন ইআরডি সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন।

ক্ষমতাধর দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ৮১তম

সিইওওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের র‍্যাংকিং অনুযায়ী, ২০২১ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ১০০টি দেশের তালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সিইওওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের করা ১৯০টি দেশের এ তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮১তম। জরিপে ১০০ নম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ৬১ দশমিক ৬৭। সর্বোচ্চ ৯৮ দশমিক ০৯ স্কোর নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চীন। এরপর রয়েছে যথাক্রমে রাশিয়া, ভারত ও ফ্রান্সের নাম। তালিকার ছয় নম্বরে রয়েছে জার্মানি। সাত নম্বরে রয়েছে জাপান। এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইসরায়েল। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তালিকায় বাংলাদেশের ওপরে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এর মধ্যে ভারতের অবস্থান চতুর্থ, পাকিস্তান ৩৭ তম এবং শ্রীলঙ্কা ৮০তম। ১৯শে অক্টোবর থেকে ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্লোবাল বিজনেস পলিসি ইনস্টিটিউটের সঙ্গে এই জরিপ পরিচালনা করেছে সিইওওয়ার্ল্ড সাময়িকী।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

নজিরবিহীন নানা ঘটনার শেষে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন জোসেফ রবিনেট বাইডেন জুনিয়র, যিনি জো বাইডেন নামেই পরিচিত। তাঁর শপথের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন দিনের সূচনা হলো।

২০শে জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা ৪১ মিনিটে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এর কয়েক মিনিট পর প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ৭৮ বছর বয়সি জো বাইডেন।

অভিষেক ভাষণে বাইডেন বলেন, এই দিনটি আমেরিকার, এই দিনটি গণতন্ত্রের, এই দিনটি ইতিহাসের, এই দিনটি আশা-আকাঙ্ক্ষার। করোনা মহামারি এবং বিভাজনের রাজনীতি প্রসঙ্গে বাইডেন বলেন, শুধু মুখের কথায় এসব সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এজন্য গণতন্ত্রে সুপ্ত থাকা সকল শক্তি আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

মৌসুমি ফল উৎপাদনে শীর্ষ দশে বাংলাদেশ

কৃষি নিয়ে সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রভাব পড়েছে ফলের উৎপাদনে। একযুগে ফলের উৎপাদন বেড়েছে বিশ লাখ মেট্রিক টনের বেশি। উৎপাদন বৃদ্ধির হারে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ প্রথম। মৌসুমি ফল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। শুধু গত এক বছরেই দেশে উৎপাদিত ফলের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় আড়াই লাখ মেট্রিক টন। দেশের ফল চাষিরাও বেশ ভালো অর্থ পাচ্ছে। অনেকের ভাগ্য বদলাচ্ছে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ফল চাষের মাধ্যমে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্যমতে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশি-বিদেশি জাত মিলে ৭ লাখ ২৯ হাজার ২৮০ হেক্টর জমিতে, উৎপাদিত ফলের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২৩ লাখ ৮৯ হাজার টন। এর আগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ হেক্টর জমিতে ফলের উৎপাদন হয়েছিল ১ কোটি ২১ লাখ ৫২ মেট্রিক টন। একদিকে বেড়েছে দুই হাজার হেক্টর জমি, অন্যদিকে গত অর্থবছরের আগের চেয়ে ২ লাখ ৩৭ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন বেড়েছে।

আদমশুমারিতে আলাদা পরিচয় পাচ্ছেন হিজড়ারা

এবারের আদমশুমারিতে আলাদা পরিচয় পাচ্ছেন হিজড়ারা। নারী বা পুরুষ নয়, এবার প্রথমবারের মতো পৃথক লৈঙ্গিক পরিচয়ে গণনা করা হবে তাদের। এ বছরই অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ আদমশুমারি। লৈঙ্গিক স্বীকৃতি পাওয়ার পর এবার আদমশুমারিতে হিজড়ারা পুরুষ-নারীর পাশাপাশি হিজড়া লিঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। সমাজসেবা অধিদফতরের হিসাবে দেশে হিজড়ার সংখ্যা ১০ হাজারের কিছু বেশি। তবে এই সংখ্যা অনেকটা অনুমাননির্ভর। সংখ্যার এই বিভ্রান্তি দূর করতে ২০২১ সালের আদমশুমারিতে প্রথমবারের মতো নারী-পুরুষের বাইরে হিজড়া হিসেবে অন্তর্ভুক্তির এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন হিজড়ারা।

সুন্দরবনে খনন করা হচ্ছে ৮৮টি পুকুর

ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সাইট সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মায়াবী হরিণসহ সব প্রাণীর মিঠাপানির চাহিদা মেটাতে খনন ও পুনর্খনন করা হচ্ছে ৮৮টি পুকুর। একইসঙ্গে দিনে দুবার সমুদ্রের জোয়ারের পানিতে প্লাবিত লবণাক্ত বনভূমিতে ৭০টি পুকুরে পাকাঘাটও নির্মাণ করা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণীদের দীর্ঘদিনের সুপেয় পানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সুন্দরবনে থাকা বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বনজীবী ও পর্যটকদেরও সুপেয় পানির চাহিদা মেটাবে এসব পুকুর। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পুকুর খনন ও পুনর্খননে ব্যয় হচ্ছে ৪ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মায়াবী হরিণসহ বন্যপ্রাণীর আধিক্য রয়েছে এমন এলাকাগুলোয়। এসব পুকুর খনন ও পুনর্খননের কাজ শেষ হলে বন্যপ্রাণীগুলোকে আর লবণাক্ত পানি পান করতে হবে না।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

চালু হলো 'সবার ঢাকা' অ্যাপ

১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'সবার ঢাকা' অ্যাপ-এর উদ্‌বোধন করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের

মেয়র আতিকুল ইসলাম, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এ সময় উপস্থিত ছিলেন। 'সবার ঢাকা' অ্যাপ-এর মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ জানিয়ে কর্পোরেশনের সেবা নিতে পারবেন। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে– মশা নিধন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক বাতি, রাস্তাঘাট, নালা ও খাল দখলমুক্তকরণসহ অবৈধ স্থাপনা সরানো, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিকটস্থ পাবলিক টয়লেট খোঁজা, নারী ও শিশু সমস্যা সমাধান প্রভৃতি। নগরবাসীর জন্য 'সবার ঢাকা' অ্যাপ উপহার হিসেবে উল্লেখ করে মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, এই অ্যাপ নাগরিক ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সংযোগ তৈরি করবে। নাগরিকরা এই অ্যাপ ব্যবহার করে তাদের সমস্যা জানাতে পারবেন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন সাড়া দেবে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের ১২ উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৬ই জানুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি ভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জানান, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের মাধ্যমে গত বছর একশ কোটি মার্কিন ডলার দেশে এসেছে। এই খাতের উন্নয়নে অষ্টম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ১২টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। করোনা পরবর্তী পৃথিবী হবে পুরোপুরি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর। তিনি আরো জানান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইসিটি অবকাঠামো তৈরি, বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্র্যান্ডিং, গ্রামীণ অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা নিশ্চিত করা। এই পরিকল্পনা সামনে রেখে আইসিটি বিভাগের সেই ১২টি উদ্যোগ হলো সেন্টার অব এক্সিলেন্স, এজেন্সি টু ইনোভেট, স্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেকটিভিটি, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমি, এনহান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি প্রজেক্ট, ইন্টার অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম, সাইবার সিকিউরিটি হেল্পডেস্ক, ওপেন ডেটা এ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম (জনতার সরকার), ভার্চুয়াল কোর্ট, ন্যাশনাল ডিজিটাল হেলথ, ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

রপ্তানি বাড়াতে সরকার সহায়তা দিচ্ছে

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী ৯ই ডিসেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক্সপোর্টে কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (ইসিফোরজে) প্রকল্পের আওতায় পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার কন্সট্রেইন্টস (পি আই এফ আইসি) কর্মসূচির অনলাইনে অংশ নিয়ে উদ্‌বোধন করেন। এসময় তিনি বলেন, দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার সহায়তা দিচ্ছে। তবে রপ্তানিকারকদেরও এগিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান ব্যাবসাবান্ধব সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এগিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ২০৩০ সালে বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা এসডিজি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হবে।

জাহাজ শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ তুরস্কের

স্পেশাল ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তুরস্ক। তারা বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে এবং চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) প্ল্যান্ট স্থাপনে যৌথভাবে বিনিয়োগ করতে চায়। বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মুস্তাফা ওসমান তুরান ৩রা জানুয়ারি সচিবালয়ে নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতকালে তিনি এ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের দক্ষ ও শিক্ষিত নাবিকদের তুরস্কের মার্চেন্ট শিপে নিয়োগ এবং মেরিটাইম সেক্টরে দুই দেশের সার্টিফিকেট অব কমপিটেন্সি (সিওসি) স্বীকৃতির আহ্বান জানান। এতে করে দুই দেশের নাবিকদের চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি বিনিময় এবং বাংলাদেশের প্রকৌশলী, পিপিপি এক্সপার্টস ও কারিগরি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রদূত নাবিকদের তুরস্কের মার্চেন্ট শিপে নিয়োগ, সিওসির স্বীকৃতি, জাহাজ নির্মাণে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি বিনিময় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিষয়ে আশ্বাস দেন।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে ডিসেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি এক অনুষ্ঠানে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দেন–পিআইডি

স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেন। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত হবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান এবং করোনাকালে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে অন্য বই পড়ার ও শরীরচর্চা, খেলাধুলার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা চালিয়ে নেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ করেন।

মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের আইডি নম্বর দেওয়ার নির্দেশ

করোনা মহামারির কারণে এ বছর বার্ষিক পরীক্ষা না হওয়ায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের নতুন ক্লাসে রোল নম্বরের পরিবর্তে আইডি নম্বর দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) ৪ঠা জানুয়ারি সকল অঞ্চলের পরিচালক, উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, সহযোগিতার মনোভাব তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদের রোল নম্বর প্রথার পরিবর্তে আইডি নম্বর ব্যবহারে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে বলে মাউশি। ২৯শে ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ২০২১ মাধ্যমিকে রোল নম্বর-এর পরিবর্তে আইডি নম্বর প্রথা চালুর কথা বলেন। তিনি বলেন, রোল নম্বর নিয়ে অনেক সময় সমস্যা হয়। এর কারণে একটা অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতা হয় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সময় যে সহযোগিতার মনোভাব থাকা দরকার তার অভাব ঘটে। তাই এই প্রথার প্রচলন হলে অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা সৎ প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি মোবাইল ফোনে প্রেরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জানুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত সামাজিক নিরাপত্তাবলয় (এসএসএন) -এর বিভিন্ন ভাতা সরাসরি উপকারভোগীদের মোবাইল ফোনে প্রেরণের উদ্যোগের উদ্‌বোধন করেন। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান 'নগদ' ও 'বিকাশ'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাতাভোগী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সরাসরি উপকারভোগীদের মোবাইল ফোনে প্রেরণ করা হবে।

মন্ত্রিসভায় শিক্ষা বোর্ডগুলোর আইন সংশোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই জানুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভার্চুয়ালি সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ১৯৬১' এবং সংশোধিত 'বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন ২০১৮' ও 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড আইন ২০২০'-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। এতদিন শিক্ষা বোর্ডগুলোর আইনে পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ছাড়া ফল প্রকাশের কোনো বিধান ছিল না। কিন্তু সংশোধিত আইন অনুযায়ী পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ছাড়াই যে-কোনো দুর্যোগে ফল প্রকাশ করতে পারবে শিক্ষা বোর্ডগুলো।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও নিজস্ব অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে চায় তুরস্ক

২১শে জানুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও ফরেন ইকোনমিক রিলেশন বোর্ড অব তুর্কি (ডিইআইকে)-এর যৌথ উদ্যোগে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত 'Turkey and Bangladesh: A New Era in Investment & Trade' শীর্ষক ওয়েবিনারে বাংলাদেশে বিপুল বিনিয়োগ ও নিজস্ব অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন ডিইআইকে'র সভাপতি Nail Olpak.

অনুষ্ঠানে উদ্‌বোধনী বক্তব্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ পরিস্থিতি ও গত বারো বছরের বাংলাদেশের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশে বিনিয়োগে রয়েছে বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার, যার ফলে বাংলাদেশ এখন নিরাপদ বিনিয়োগের আস্থায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন,

বিনিয়োগকারীদের আন্তর্জাতিক মানের সেবা দেওয়ার পরিকল্পনায় ওএসএস-এর মাধ্যমে ৪১টি সেবা দেওয়া হচ্ছে। এ বছরের শেষ নাগাদ আরো ৩৫টি সংস্থার মাধ্যমে মোট ১৫৪টি সেবা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এ সময় তিনি তুরস্কের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে অধিক হারে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ-তুরস্কের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে গত বারো বছরে বাংলাদেশের আমূল পরিবর্তন হয়েছে, এখন আমাদের কাঠামোগত উন্নয়নগুলো ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে, যার ফলে বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ। বিশ্বে প্রবৃদ্ধির নিরিখে অগ্রসর ২০ দেশের অন্যতম দেশ বাংলাদেশ।

কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে জার্মানিকে বিনিয়োগ করার আহ্বান

কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে জার্মানিকে বিনিয়োগ ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। কৃষিমন্ত্রী ১৪ই জানুয়ারি ২০২১ 'বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের রপ্তানি ও বাণিজ্যের সুযোগ' শীর্ষক ভার্চুয়াল সম্মেলনে এ আহ্বান জানান। জার্মানির বাংলাদেশ দূতাবাস এবং জার্মান এগ্রিবিজনেস অ্যালায়েন্স এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ রয়েছে উল্লেখ করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে চলমান বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরো কার্যকরভাবে বৃদ্ধি করার অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে মানসম্পন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন, এগ্রো-প্রসেসিং, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ভ্যালু চেইন ও রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরিতে জার্মানির বিনিয়োগ ও সহযোগিতার সুযোগ অনেক।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী ভারত

ভারতের মাহিন্দ্র অ্যান্ড মাহিন্দ্র লিমিটেড বাংলাদেশে কৃষি যন্ত্রপাতির সংযোজন কারখানা করবে। এছাড়া প্রান্তিক পর্যায়ে যন্ত্রের ব্যবহার জনপ্রিয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর করতে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির ব্যাপারেও উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ১২ই জানুয়ারি ২০২১ কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে মাহিন্দ্র অ্যান্ড মাহিন্দ্র লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও পবন গোয়েঙ্কা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ আগ্রহের কথা জানান।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকার এবছর ২০০ কোটি টাকার মাধ্যমে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ ভরতুকিতে কৃষকদের কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপারসহ কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। এছাড়াও ৩ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ৫১ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার বছরে প্রায় ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের যা বছরে শতকরা ১০ ভাগ হারে বাড়ছে। এ বিশাল বাজারে বিনিয়োগের অনেক সুযোগ রয়েছে ভারতের।

বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে কৃষিমন্ত্রী জানান, মাহিন্দ্র সংযোজন কারখানা স্থাপনের পাশাপাশি এদেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও যারা খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি করছে তাদেরকেও যন্ত্রাংশ তৈরির দায়িত্ব প্রদান করবে। যাতে করে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি হয়।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

৮০টি উপজেলায় হবে বিউটি পারলার

নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর ছাড়িয়ে উপজেলা পর্যায়েও বিউটি পারলার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। দেশের ৮০টি উপজেলায় এ পারলার স্থাপনের লক্ষ্যে ৪৪১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এটি বাস্তবায়ন করবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এমন ৮০টি উপজেলা ইতোমধ্যে বাছাই করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, প্রকল্পটির আওতায় বিউটি পারলারের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ৮০টি ফুড কর্ণার এবং বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ২ লাখ ৫৬ হাজার নারী বাছাই করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৫ থেকে ১০ জন মিলে একেকটি পারলার, ফুড কর্নার ও বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করবেন। তাদের এককালীন টাকা দেবে সরকার। বিউটি পারলার সাজাতে যেসব উপকরণ প্রয়োজন হয়, সেসবও সরবরাহ করা হবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ২১শে জানুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

চতুর্থবারের মতো স্পিকার নির্বাচিত হলেন পেলোসি

যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা ন্যান্সি পেলোসি চতুর্থবারের মতো কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন। ৩রা জানুয়ারি পরিষদে ভোটাভোটির মাধ্যমে তার এ বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম এবং একমাত্র নারী স্পিকার তিনি।

পেলোসি ১৯৭৬ সালে রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৮৮ সালে তিনি কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালে কংগ্রেস প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার পদ। এই স্পিকার, তার ডেপুটিরা ও বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান নির্ধারণ করে থাকেন কোন ইস্যুতে প্রতিনিধি পরিষদে আলোচনা হবে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৪ই জানুয়ারি ২০২১ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি মোবাইল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপকারভোগীদের নিকট সরাসরি প্রেরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার উপকারভোগীদের সাথে কথা বলেন–পিআইডি

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর উপহার জমিসহ পাকা বাড়ি

ভূমি ও গৃহহীন পরিবার ৬৬ হাজার ১৮৯টি পাকা ঘর পেলেন। পরিবারপ্রতি দুই শতক জমি ও পাকা বাড়ির মালিকানা পেলেন গৃহহীনরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে জানুয়ারি ভিডিও কনফারেন্সে উদ্‌বোধনের মাধ্যমে তাদের হাতে বসতবাড়ির মালিকানা তুলে দেন।

'দেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না'– শেখ হাসিনার এ ঘোষণা বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে জমিসহ পাকা বাড়ি পাচ্ছেন দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলো। গৃহহীনদের জন্য নির্মিত বাড়িগুলোতে দুটি করে থাকার ঘর, একটি করে টয়লেট, রান্নাঘর ও বারান্দা রয়েছে। সব বাড়ি একই নকশায় তৈরি করা হয়েছে। এতে থাকছে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। এছাড়া বাড়ি বরাদ্দপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধাও চালু করবে সরকার। 'ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা ২০২০' অনুযায়ী সারা দেশে আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারকে বসতবাড়ি দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসকদের করা তালিকা অনুযায়ী, দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা দুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি। জমি আছে কিন্তু ঘর নেই– এমন পরিবারের সংখ্যা পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারকে দুই শতক সরকারি খাসজমিতে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস এ কার্যক্রমকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পুনর্বাসন কার্যক্রম বলে দাবি করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকার ঘোষিত চলমান মুজিববর্ষে সারাদেশের ৬৪টি জেলায় তৃণমূল পর্যায়ে তালিকা করে ছিন্নমূল ও দুস্থ পরিবারকে এ ধরনের বিশেষ ঘর দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে আরো উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবন করতে হবে

উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে আরো উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবনের জন্য ধান বিজ্ঞানী ও গবেষকদের আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এক সময় খাদ্য ঘাটতির ও ক্ষুধার দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি যা এখন বেড়ে হয়েছে ১৬ কোটির ওপরে। এর সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগতো আছেই। তারপরও বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে ব্রি-র উদ্ভাবিত জাত ও বিজ্ঞানীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তায় মূল চ্যালেঞ্জ হলো দেশের জনসংখ্যা প্রতিবছর ২২-২৩ লাখ বৃদ্ধি পাচ্ছে; অথচ নানান কারণে চাষের জমি কমছে। সেজন্য, ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে হলে আরো উন্নত জাত ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন করতে হবে। কৃষিমন্ত্রী ১৪ই জানুয়ারি গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মিলনায়তনে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। ব্রি ২০১৯-২০২০ বছরের গবেষণা পর্যালোচনা বিষয়ক এ কর্মশালাটি আয়োজন করে।

ব্রি উদ্ভাবিত শতাধিক জাতের ধানের প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, এই জাতগুলো থেকে সেরাগুলো নিয়ে সকল সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে কৃষকের নিকট এগুলো জনপ্রিয় হয়, কৃষকের নিকট সহজে পৌঁছানো হয়। তিনি বলেন, একটি পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ জাত না করে বহু পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ জাতের ধান উদ্ভাবন করতে হবে। এছাড়া, মোটা চালের চাহিদা দিন দিন কমছে, সেজন্য চিকন চাল এবং কৃষক ও ভোক্তার চাহিদা বিবেচনা করে জাত উদ্ভাবনে এগিয়ে আসতে হবে।

চাষিদের কাছে পাট চাষকে লাভজনক করে তোলা হবে

অন্যের উপর নির্ভরশীল না থেকে পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আমরা পাটবীজের জন্য

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ১৪ই জানুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০১৯-২০২০' এ প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারি না। আমরা পাটবীজের উৎপাদন বাড়াব। পাটের উৎপাদন বাড়াব। পাট চাষকে এদেশের চাষিদের নিকট লাভজনক ফসলে উন্নীত করব। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য পাটের অসাধারণ ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আবার ফিরিয়ে আনব। কৃষিমন্ত্রী ৭ই জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে রোডম্যাপ বাস্তবায়ন' বিষয়ে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও সময়োপযোগী উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাটের জিনোম আবিষ্কার করেছে। সেই জিনোম ব্যবহার করে আমাদের বিজ্ঞানীরা উচ্চফলনশীল পাটবীজ রবি-১ জাত উদ্ভাবন করেছেন, যার ফলন ভারতের পাটজাতের চেয়ে ১০-১৫ ভাগ বেশি। কৃষক পর্যায়ে এটির চাষ বাড়াতে পারলে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব। তিনি আরো বলেন, দেশে পাটবীজ উৎপাদনের মূল সমস্যা হলো অন্য ফসলের তুলনায় কম লাভজনক হওয়ায় কৃষকেরা চাষ করতে চায় না। পাটবীজে কৃষকদের আগ্রহী করতে ও কৃষকেরা যাতে চাষ করে লাভবান হয় সেজন্য ভরতুকির ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশে বছরে কৃষক পর্যায়ে প্রত্যায়িত বীজের চাহিদা হলো পাঁচ হাজার ২ শত ১৫ মেট্রিক টন। আর চাহিদার বিপরীতে বিএডিসি সরবরাহ করে ৭৭৫ মেট্রিক টন। পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে চার হাজার ৫০০ মেট্রিক টন পাটবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

ময়মনসিংহে সর্ববৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে যুক্ত

জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে ময়মনসিংহে অবস্থিত দেশের সর্ববৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে স্মার্ট ফটোভোলটাইক (পিভি) ইনস্টলের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে এই সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি যুক্ত হয়েছে। ৭৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে এই কেন্দ্রের। ফটোভোলটাইক সিস্টেম এমন একটি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, যা ব্যবহারযোগ্য সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহে কাজ করে। সৌর প্যানেল, সোলার ইনভার্টার, মাউন্টিং, ক্যাবলিং এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ সংবলিত এই ফটোভোলটাইক সিস্টেম সবকিছুর মাঝে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ওয়ার্কিং সিস্টেম নিশ্চিত করে। হুয়াওয়ে তথ্যমতে, দক্ষিণ এশিয়ায় আদ্র ও উষ্ণ জলবায়ুর দেশ বাংলাদেশে প্রতিবছর আড়াই হাজার ঘণ্টার বেশি সূর্যালোক থাকে। আর এটা বিবেচনায় রেখে এ প্রকল্পের সর্বোচ্চ সক্ষমতায় আইপি৬৬ উচ্চস্তরের সুরক্ষা এবং অ্যান্টি-পিআইডি প্রযুক্তিসহ হুয়াওয়ে এসইউএন ২০০০-১৮৫ কেটিএল স্মার্ট পিভি স্ট্রিং ইনভার্টার ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। ১৭৩টি সোলার প্যানেল এবং ৩৩২ ইনভার্টারের মাধ্যমে প্রকল্পটি জাতীয় গ্রিডে অবদান রাখবে। হুয়াওয়ে বিশ্বের ১৭০টির বেশি দেশ ও অঞ্চলে সেবা দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি গত ২১ বছর ধরে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও নানা খাতে কাজ করে যাচ্ছে।

আলোকিত হচ্ছে চর কুকরি মুকরি

চর কুকরি মুকরি ভোলা সদর থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে জেগে উঠেছে এই দ্বীপকন্যা। দ্বীপকন্যায় এখন বিদ্যুতের আলো পৌঁছাচ্ছে। এভাবে চর থেকে দুর্গম চরে সাবমেরিন ক্যাবলে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ১৬ই জানুয়ারি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, চরের জীবনে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দেওয়াতে রীতিমতো উৎসব শুরু হয়ে গেছে। অনেকদিনের অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে এসব দুর্গম এলাকার মানুষও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ভোলা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে অফগ্রিড এলাকার এসব চরের মানুষের জন্য সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে যাচ্ছেন ৩৭ হাজারের বেশি গ্রাহক। ভোলা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি তাদের অফগ্রিড এলাকা ১৬টি চরের মানুষের সঙ্গে নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজে স্থানীয়দের সম্পৃক্ত করে। বর্তমানে গ্রিড এলাকার শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। এখন কাজ চলছে অফগ্রিড যেসব এলাকা রয়েছে সেখানকার মানুষের কাছে। বিদ্যুতের আলো পৌঁছানোর কাজ। এক হাজার ৫৯টি গ্রামে তিনটি ধাপে এ বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

আবহাওয়ার আগাম বার্তা পেতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ

আবহাওয়ার তথ্য সেবা ও আগাম সতর্ক বার্তা পদ্ধতি জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫২০ কোটি ১৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তা ৪৬২ কোটি ৯৩ লাখ টাকা আর বাকি ৫৭ কোটি ২২ লাখ টাকা সরকারি অর্থায়নে। 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা' প্রকল্পের আওতায় এটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৬ই জানুয়ারি সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান ১৬ই জানুয়ারি ২০২১ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বর্তমান সরকারের সফল একযুগ পূর্তিতে 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ও মতবিনিময় সভায় বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়। বৈঠকে আরো জানানো হয়, ২০১৬ সালের জুলাই মাসে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। শেষ হওয়ার কথা চলতি বছরের জুন মাসে। প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০টি উপজেলায় স্বয়ংক্রিয় কৃষি আবহাওয়া যন্ত্র স্থাপন, চারটি বিভাগীয় শহরের ওয়াসা অফিসে ৬৫টি স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন এবং ৩৫টি সনাতন পর্যবেক্ষণাগারে স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরে আবহাওয়া যন্ত্রপাতি স্থাপন করে নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা হবে। এছাড়া ঊর্ধ্বাকাশের আবহাওয়ার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ১১টি আন্তর্জাতিক মানের পোর্টেবল হাইড্রোজেন গ্যাস জেনারেটর স্থাপন করা হবে। গ্লোবাল টেলিকমিউনিকেশন সুইচিং সিস্টেম আধুনিকায়ন করা হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে রোল মডেল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ সমাদৃত হয়েছে সারা বিশ্বে। দারিদ্র্য বিমোচনসহ সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং সর্বক্ষেত্রে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ এখন দৃশ্যমান। প্রতিমন্ত্রী ১৬ই জানুয়ারি ঢাকায় সরকারের টানা একযুগ পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানজট নিরসনে নির্মিত হচ্ছে ৬টি মেট্রোরেল রুট

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন এবং গণপরিবহণের সক্ষমতা বাড়াতে ২০৩০ সালের মধ্যে সরকার ছয়টি মেট্রোরেল রুট নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। এই ছয় প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হবে ১২৮ কিলোমিটার রেলরুট। যার ৬৭ কিলোমিটার হবে উড়ালপথ এবং ৬১ কিলোমিটার হবে পাতালপথ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে উদ্‌বোধন হওয়ার কথা ২১ কিলোমিটারের বেশি চলমান মেট্রোরেলের কাজ। ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে উড়াল পথে তিন কিলোমিটার রেললাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। চলছে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপনের কাজও। মেট্রোরেলের উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত প্রথম অংশের এগারো কিলোমিটার উড়ালপথ ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। যানজটের সীমাহীন জনভোগান্তি কমাতে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশের ভিত্তির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে ১১১টি সুপারিশ

সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১১১টি দফা সুপারিশ বাস্তবায়নে গঠিত চারটি কমিটি তাদের প্রস্তাব জমা দিয়েছে। সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনা কমাতে ১১১টি সুপারিশ ছিল। সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১১১টি দফা সুপারিশ ধীরে ধীরে বাস্তবায়নে যাব। সুপারিশগুলো কীভাবে বাস্তবায়নে যাবে এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সভায় যে প্রস্তাবগুলো আসছে সেগুলোর কোনোটা স্বল্পমেয়াদি, কোনোটা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি। এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। বিস্তারিতভাবে কাজ করার জন্য চারটি কমিটি রয়েছে। তারা ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা যে রিপোর্ট পেয়েছি তার অনেক কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

রাঙামাটি টু ঢাকা-ময়মনসিংহ রিলাক্স পরিবহণ

যাত্রীসেবা নিশ্চিত এবং মানসম্মত দূরপাল্লার নন-এসি বাস সার্ভিস রাঙামাটি টু ঢাকা-আব্দুল্লাহপুর ও ময়মনসিংহ রিলাক্স পরিবহণের ফিতা কেটে ও শান্তির পায়রা এবং বেলুন উড়িয়ে শুভ উদ্‌বোধন করেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অংসু পু চৌধুরী।

৯ই জানুয়ারি রাঙামাটি শহরের পুরাতন বাস স্টেশনে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি মোটর মালিক সমিতির ব্যবস্থাপনায় এ দূরপাল্লার যাত্রীসেবা নিশ্চিতে এ রিলাক্স পরিবহণের বাস সার্ভিসটি চালু করা হয়।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনার টিকা দেওয়া শুরু করল বাংলাদেশ

করোনা মোকাবিলায় একজন সম্মুখসারির যোদ্ধা জ্যেষ্ঠ নার্স রুনু ভেরোনিকা কস্তাকে টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে এ মহামারি নিয়ন্ত্রণে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল বাংলাদেশ। ২৭শে জানুয়ারি বিকাল চারটার পর রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে তাকে করোনার টিকা দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ টিকাদান অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ করেন-পিআইডি

কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে টিকাদান কর্মসূচি উদ্‌বোধনের পর এই হাসপাতালের চিকিৎসক আহমেদ লুৎফুল মোবেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা, মতিঝিল বিভাগের ট্রাফিক সার্জন মো. দিদারুল ইসলাম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম ইমরান হামিদসহ মোট ২১ জন টিকা দেন।

রাজধানীর আরো পাঁচটি হাসপাতালে ২৮শে জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এ টিকাদান কর্মসূচি। উল্লেখ্য, ২১শে জানুয়ারি ভারত সরকারের উপহার দেওয়া ২০ লাখ টিকা পায় বাংলাদেশ। ২৫শে জানুয়ারি ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে কেনা ৩ কোটি টিকার প্রথম চালান হিসেবে ৫০ লাখ টিকা আসে ঢাকায়। আগামী পাঁচ মাসে আরো আড়াই কোটি টিকা আসবে দেশে।

করোনা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অবস্থান ২০তম

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, বিশ্বে করোনা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অবস্থান ২০তম। করোনা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সুনাম বেড়েছে। বিশ্বের বড়ো বড়ো দেশ যেখানে করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, সেখানে আমাদের দেশে করোনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে করোনায় মৃত্যুহার অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক কম। ১৬ই জানুয়ারি মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের ছাদে শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মাইনাসে চলে গেছে। আমাদের দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। আমাদের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এখনো দেশ থেকে করোনা চলে যায়নি, তাই সবাইকে মাস্ক পরতে হবে।

সারা দেশে ৭ই ফেব্রুয়ারি টিকাদান শুরু

সরকার ৭ই ফেব্রুয়ারি সারা দেশে টিকা দেওয়ার দিন ঠিক করেছে ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রথম ডোজ টিকা দেওয়া হবে। এই সময়ে ৬০ লাখ মানুষকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। আর দ্বিতীয় ডোজ টিকা দেওয়া হবে আট সপ্তাহ পর। একটি কেন্দ্রে দৈনিক ১০০ থেকে ১৫০ জনকে টিকা দেওয়া হবে। সারা দেশে মোট ৬ হাজার ৯৯৫টি কেন্দ্র থেকে টিকা দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে জেলায় জেলায় টিকা পৌঁছে গেছে। ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত করোনা টিকা পাওয়ার জন্য সুরক্ষা ওয়েবসাইটে ১৭ হাজার মানুষ নিবন্ধন করেছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

বিপুল সম্ভাবনাময় 'বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে' কর্মসংস্থান হবে ১৫ লাখ মানুষের

করোনা মহামারির কালেও ৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো। দেশীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি এসব অঞ্চলে গত বছর সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, সিঙ্গাপুর এবং যুক্তরাজ্য থেকে। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রস্তাবনায় শীর্ষে রয়েছে সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক জোন খ্যাত মীরসরাইয়ের 'বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর'। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে ৪১ ধরনের বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) তথ্যমতে, সব মিলিয়ে সংস্থাটির মাধ্যমে গত বছর করোনা মহামারির মধ্যেই বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে ৩৯৮ কোটি ডলারের। যারমধ্যে দেশীয় উদ্যোক্তাদের অংশ ৩৪৮ কোটি ডলার। যা মোট প্রস্তাবের ৮৭ শতাংশেরও বেশি। সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে।

বেজা'র তথ্যমতে, ফেনীর সোনাগাজী, চট্টগ্রামের মীরসরাই ও সীতাকুন্ডু ঘিরে ৩৩ হাজার একর জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর'। এটি হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল। এখানকার শিল্পকারখানায় বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে জানিয়েছে বেজা। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ ও দেশের ১৫ লাখ মানুষের কাজের ঠিকানা হবে এ শিল্পনগরী। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে ২৬টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরুর প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়াও ৩৭টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটির (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী জানান, এটি একটি বিস্তৃত শিল্পনগরী। এখানে সব ধরনের ভারী শিল্প স্থাপিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ব্যাপক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরি হবে। আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শিল্পনগরীটির অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ করতে বদ্ধপরিকর। এটি বাস্তবায়ন হলে এখানেই অন্তত ১৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে। ১৫ই জানুয়ারি মেহেরপুরে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের উদ্‌বোধনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুব শক্তিকে যদি কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তোলা যায় তবে খুব দ্রুতই দেশকে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তাই সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার ওপর আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, পায়রা বন্দর গতিশীল করতে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের গভীরতা ৬ দশমিক ৩ মিটার বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিশীলতা ধরে রাখার লক্ষ্যে রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরি মেইনটেনেন্স (রক্ষণাবেক্ষণ)

ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংয়ের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাপিটাল ড্রেজিং শুরু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে যার ফলে ১০ দশমিক ৫ মিটার ড্রাফট বিশিষ্ট বাণিজ্যিক জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারবে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক বিদেশি জাহাজ বন্দরে আগমন করবে এবং দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে। তিনি বলেন, আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ ৪২ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের কাজটি নিজস্ব অর্থায়নে করতে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করতে পারছেন বলেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও চিন্তাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারছেন। নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ১৬ই জানুয়ারি পটুয়াখালীতে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজের উদ্‌বোধনকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পায়রা বন্দর ২০৩৫ সালে দেশের অর্থনীতিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। প্রধানমন্ত্রীর কর্মকাণ্ড শুধু দেশে নয়; সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে; ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পদার্পণ করবে। উল্লেখ্য, পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলে ৬ দশমিক ৩ মিটার গভীরতা বজায় রাখার লক্ষ্যে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বেলজিয়ামভিত্তিক ড্রেজিং কোম্পানি জান ডে নুল (Jan De Nul) এর মধ্যে ২০২০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই ঢাকা-কক্সবাজার ট্রেন চলবে

রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইনের কাজ সম্পন্ন হবে এবং ঢাকা থেকে সরাসরি কক্সবাজার ট্রেন চালু হবে। ১৪ই জানুয়ারি কক্সবাজারে আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে মন্ত্রী এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ধরা হলেও বাকি ছয় মাস হাতে রেখেই আগামী বছরেই মানুষ কক্সবাজারে ট্রেনে করে আসতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবহেলিত রেল খাতকে গুরুত্ব দিয়ে এর ব্যাপক উন্নয়ন করছেন। তিনি আলাদা মন্ত্রণালয় করে দিয়েছেন। রেলওয়েতে এখন অনেক প্রকল্প চলমান আছে। মূলত ২০১১ সালের পর থেকেই রেলওয়েকে পুনর্গঠিত করার কাজ শুরু হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, সরকারের দশটি মেগা প্রকল্পের মধ্যে দুটি হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ের। যার একটি হচ্ছে দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত নতুন রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প। ভবিষ্যতে কক্সবাজার থেকে রামু হয়ে মিয়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত নেওয়া হবে এবং যা চীন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এই রেললাইন চালু হলে পর্যটনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। দেশের অগ্রগতিতে পর্যটন খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পটি পরিকল্পনা মাফিক করা হচ্ছে। আইকনিক স্টেশন ভবনটি আন্তর্জাতিক মানে তৈরি হবে এবং এর মাধ্যমে দেশি-বিদেশি প্রচুর পর্যটক আসবে। উল্লেখ্য যে, ২১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজারে ঝিনুকের আদলে একটি আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন ভবন নির্মিত হচ্ছে। ৬তলা বিশিষ্ট এ ভবনে আন্তর্জাতিক মানের সকল সুবিধা রাখা হবে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

মিঠাপুকুর মসজিদ

রংপুর শহর থেকে প্রায় ২৪ কিমি. দক্ষিণে রংপুর বগুড়া পাকা সড়কের পাশে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বিশাল জলাশয়ের পাশে রয়েছে এক দৃষ্টিনন্দন পুকুর যার নাম 'মিঠাপুকুর'। প্রাচীন এই দিঘিটি প্রাক-মুসলিম যুগের বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করছেন। এই জলাশয়ের নামানুসারে এ উপজেলার নাম হয়েছে মিঠাপুকুর। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করছেন মিঠাপুকুর মসজিদটি মোগল আমলের শেষদিকে অথবা কোম্পানি আমলে নির্মিত হয়েছিল। আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের পরিমাপ ১০,৬৬৪.১১ মিটার। মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায়, জনৈক শেখ মোহাম্মদ

সাবেরের পুত্র শেখ মোহাম্মদ আছের ১৮১০ সালে মসজিদটি নির্মাণ করেন। বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের দোচালা পদ্ধতিতে

নির্মিত অপূর্ব প্রবেশ তোরণ ও মসজিদের চারকোণে চারটি টাওয়ার সমৃদ্ধ মসজিদটি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই মসজিদটি আকারে খুব বড়ো নয়। এ মসজিদের ৪টি মিনার রয়েছে। মিনারগুলো ছাদের কিছু উপরে উঠে ছোটো গম্বুজ আকৃতি ধারণ করেছে। সামনের দেয়ালে আছে ৩টি অর্ধবৃত্তাকার খিলান বিশিষ্ট দরজা। উত্তর-দক্ষিণ দেয়ালে আছে অনুরূপ একটি করে দরজা। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে তিনটি মেহরাব। উপরে আছে তিনটি সুন্দর গম্বুজ। পূর্ব দেয়ালের সামনের দিকে সুন্দর প্যানেলিং অলংকরণে সজ্জিত। মিঠাপুকুর মসজিদটি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিদর্শন হয়ে আছে।

প্রতিবেদন: ফারিহা রেজা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে পর্দা নামল ২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। যেখানে এশীয় বাছাইয়ে সেরা ছবির পুরস্কারটি অর্জন করল বাংলাদেশের *নোনাজলের কাব্য*। কলকাতার নন্দন চত্বরের মুক্তমঞ্চে চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ১৬ই জানুয়ারি। সেখানে এবারের উৎসবের সেরা পুরস্কারটি দেওয়া হয় বান্দারব্যান্ড এর জন্য ইরানের নির্মাতা মনজি হিকমতকে। তবে বাংলা ভাষার ছবি হিসেবে চমক তৈরি করেছে রিজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের ছবি *নোনাজলের কাব্য*। ছবিটি 'এশিয়ান সিলেক্ট : নেটপ্যাক' বিভাগে পুরস্কার অর্জন করে। এই চলচ্চিত্রে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জেলেদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক প্রভাব চিত্রণ করা হয়েছে। তিতাস জিয়া, তাসনুভা তামান্না, ফজলুর রহমান বাবু, শতাব্দী ওয়াদুদ, অশোক ব্যাপারী, আমিনুর রহমান মুকুল, রোজি সিদ্দিকী এবং দুলারি তাহিম চলচ্চিত্রের মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এর আগে চলচ্চিত্রটিকে বুসান, লন্ডন ও সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের আয়োজনে রাজধানীতে শুরু হয় '১৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২১'। এবারের উৎসবে বাংলাদেশসহ ৭৩টি দেশের ২২৭টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র রয়েছে ১০৭টি, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও স্বাধীন চলচ্চিত্রের সংখ্যা ১২০টি। এতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র থাকছে ৪১টি। যার মধ্যে ৩৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও স্বাধীন এবং আটটি পূর্ণদৈর্ঘ্য। মুজিব শতবর্ষ সামনে রেখে ১৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-২০২১, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে।

'নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ'– স্লোগানে ১৬ই জানুয়ারি জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে নয় দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্‌বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের উদ্‌বোধন আনুষ্ঠানিকতায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন উৎসব পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল এবং ম. হামিদ প্রমুখ।

উদ্‌বোধন পর্ব শেষে প্রদর্শিত হয় ফ্রান্সের চলচ্চিত্র স্প্রিং ব্লোসম। জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ও সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তন, শিল্পকলার নন্দনমঞ্চ, বসুন্ধরা সিটির স্টার সিনেপ্লেক্স এবং সীমান্ত স্কয়ার সিনেপ্লেক্সসহ আট মিলনায়তনে একযোগে প্রদর্শিত হয় উৎসবের চলচ্চিত্রগুলো।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ১৬ই জানুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে ঊনবিংশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

এশিয়ান ফিল্ম প্রতিযোগিতা বিভাগ, রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগ, বাংলাদেশ প্যানোরোমা, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, চিল্ড্রেন ফিল্মস, স্পিরিচুয়াল ফিল্মস, লিজেন্ডারি লিডারস হু চেঞ্জ দি ওয়ার্ল্ড, ট্রিবিউট শর্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম এবং উইমেন্স ফিল্ম মেকার বিভাগে প্রদর্শিত হয় উৎসবের ছবিগুলো। ২৪শে জানুয়ারি শেষ হয় নয় দিনের এই চলচ্চিত্র উৎসব।

প্রতিবেদন: মিতা খান

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১০ই জানুয়ারি রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ১০ই জানুয়ারি ২০২১ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন–পিআইডি

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়। সকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবনসহ সারা দেশে দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সকাল ৯টায় ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। পরে দলের পক্ষ থেকেও তিনি সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান। দিবসটি উপলক্ষে এদিন বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সীমিত পরিসরে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ঐতিহ্যবাহী সাকরাইন উৎসব

পঞ্জিকা মতে, বাংলা পৌষ মাসের শেষের দিন উদ্‌যাপন করা হয় পৌষসংক্রান্তি। দিনভর আকাশে বাহারি নকশার ঘুড়ি উড়িয়ে সন্ধ্যায় আতশবাজি আর আগুন খেলার মধ্য দিয়ে পুরান ঢাকার বাসিন্দারা ঐতিহ্যবাহী সাকরাইন উৎসব পালন করেন। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ১৪ ও ১৫ই জানুয়ারি পুরান ঢাকায় 'সাকরাইন' উৎসবে মেতে ওঠে সব বয়সি মানুষ। প্রতিবছর এ উৎসবটির জন্যে পুরান ঢাকার কাছাকাছি থাকা বাড়ির ছাদগুলো সুন্দরভাবে সাজানো হয়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী এ উৎসবের মূলে আছে গভীর আনন্দ ও মিলনের সংস্কৃতি।

বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ পুরস্কার প্রদান

দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ-২০২০ প্রদান করা হয়। ২৬শে ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সাধারণ পরিষদের ৪৩তম বার্ষিক সভায় এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন– ডা. সারওয়ার আলী (মুক্তিযোদ্ধা), নুরুল ইসলাম নাহিদ (শিক্ষা), নুহ-উল আলম লেলিন (সমাজ দর্শন ও সাহিত্য), অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান (চিকিৎসা সেবা), লিয়াকত আলী লাকী (সংস্কৃতি), জুয়েল আইচ (জাদুশিল্প), মনজুরুল আহসান বুলবুল (সাংবাদিকতা)।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, এই এলাকায় ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে যে পরিমাণ মাদকের ছড়াছড়ি ছিল এখন অনেকাংশে কমে গেছে। কিন্তু এখনো মাদক ও সন্ত্রাস নির্মূল হয়নি। মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই, কোনো ধর্ম নেই। ১৫ই জানুয়ারি গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীর মরকুন টিঅ্যান্ডটি কলোনি মাঠে আয়োজিত মাদক, সন্ত্রাস, কিশোর গ্যাং ও নারীর প্রতি ডিজিটাল ভায়োলেন্স– বিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. সাদেক আলীর সভাপতিত্বে এবং জিএমপির সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার (টঙ্গী জোন) আশরাফ উল-ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার খন্দকার লুৎফুল কবির।

জনসাধারণকে তামাকের প্রতি নিরুৎসাহিত করতে হবে

তামাকের ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরে জনগণকে তামাকের প্রতি নিরুৎসাহিত করতে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর আহ্বান জানিয়েছে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক একে এম মামুনুর রশীদ। তিনি বলেন, তামাক কারো উপকারে আসে না। তামাক যারা গ্রহণ করে তারা দ্রুত মৃত্যুর মুখে ধাবিত হয়। তামাক গ্রহণকারীদের রোগে আক্রমণ করে বেশি। তাই তামাকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানান। ১৭ই জানুয়ারি জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য কর্তৃক প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে তিনি এ কথা বলেন। রাঙামাটি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক এম মামুন এ প্রশিক্ষণের সভাপতিত্ব করেন।

মাদকাসক্ত শনাক্তে ডোপ টেস্ট শুরু

মাদকের আগ্রাসন থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষার লক্ষ্যে ময়মনসিংহে মাদকাসক্ত শনাক্তে শুরু হয়েছে ডোপ টেস্ট। ১০ই জানুয়ারি

নগরীর জয়নুল আবেদীন পার্কে ডোপ টেস্ট কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করা হয়। এদিন শনাক্তকৃতদের নিজেদের সংশোধন করে নিতে ১৫ দিন সময় বেধে দেয় প্রশাসন। মাদকের কারণে ঝরে যাচ্ছে অনেক সম্ভাবনাময় জীবন। বিশেষ করে তরুণদের একাংশ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। বাড়ছে চুরি, ছিনতাই। এমনকি মাদকের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনাও ঘটছে। এ পরিস্থিতিতে তরুণ সমাজকে রক্ষা করার জন্য ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় উদ্যোগ নিয়েছে ডোপ টেস্টের। ভ্রাম্যমাণ ডোপ টেস্ট কার্যক্রম পুরো ময়মনসিংহ জেলায় পরিচালনা করা হবে। ১০ই জানুয়ারি এ কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার কামরুল হাসান।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষে নিরাপদ পানি পেল জুরাছড়ি পাংখোয়া জনগোষ্ঠী

রাঙামাটি জুরাছড়ি উপজেলার দক্ষিণে দুমদুম্যা ইউনিয়নের ভূয়াতলীছড়া (স্থানীয় ভাষায় গণ্ডাছড়া) গ্রাম। উপজেলা থেকে ৮০-৯০ কিলোমিটার পাহাড়ি উঁচু-নিচু পথ বেয়ে যেতে হয় এই গ্রামে। ১৯৮৪ সাল থেকে গ্রামে পাংখোয়া সম্প্রদায়ের বসবাস। এইগ্রামে সবাই জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। ঘরের ব্যবহার্য ও নিরাপদ পানির একমাত্র ভরসা ছড়া। এই ছড়ার পানি আনতে পাহাড়ের উঁচু টিলা ৯ হাজার ফুট পাহাড়ের নিচে নামতে হয়। এতে সময় কেটে যেত ২ থেকে আড়াই ঘণ্টা প্রায়। মুজিববর্ষ উপলক্ষে জুরাছড়ি উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'গন্ডাছড়া পাংখোয়া পাড়ায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ' প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে নিরাপদ পানির লাইন।

দীর্ঘমেয়াদি সুফলের জন্য প্রকল্প

১৩ই জানুয়ারি পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তৃতাকালে মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকল্প প্রণয়নের সময় কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে করে পার্বত্য এলাকার চাষযোগ্য কোনো কৃষিজমি অনাবাদী না থাকে। পার্বত্য এলাকার কৃষকদের উন্নত জাতের ফল ও উচ্চমূল্যের বিভিন্ন মশলা উৎপাদনের আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু তাদের সেই সামর্থ্য নেই। এসব কৃষকদের কথা বিবেচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফল চাষ ও উচ্চ মূল্যের মশলা চাষের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

বান্দরবান বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ

বান্দরবান বাজারে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। ৯ই জানুয়ারি বান্দরবান বাজারের চৌধুরী মার্কেট প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিসদের মাধ্যমে বিতরণকৃত এই

অনুদানের চেক বিতরণ করেন পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী । ২৪শে ডিসেম্বর বান্দরবান বাজারের কেএস প্রু মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ১৩টি দোকানের মালিককে ২৫ হাজার টাকা করে মোট ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা অনুদানের চেক প্রদান করেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

এ বছরও জেএসসি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে

করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা হয়নি। সব শিক্ষার্থীকে অটোপাস দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা না হলেও অন্যান্য বছরের মতো এবারও শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। তবে নম্বরপত্র (মার্কশিট) দেওয়া হবে না। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর এস এম আমিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনার কথা জানানো হয়েছে।

বোর্ডের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ২০২০ সালে সরাসরি পরীক্ষা না নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নের মাধ্যমে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে। নির্দেশনায় জানানো হয়েছে, ফরম পূরণের জন্য সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের তালিকা ২১শে জানুয়ারি ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইটে ২৩ থেকে ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে শিক্ষার্থীদের ইলেকট্রনিক ফরম পূরণ (ইএফএফ) করতে হবে। ইলেকট্রনিক ফরম পূরণ করতে কোনো ফি শিক্ষাবোর্ডকে দিতে হবে না।

দুই কিলোমিটারের মধ্যে স্কুল না থাকলে নির্মাণের সুপারিশ

দেশের কোনো এলাকায় দুই কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকলে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্কুল নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে। ৬ই জানুয়ারি একাদশ জাতীয় সংসদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১১তম বৈঠকে এ সুপারিশ করা হয়। কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া সভায় ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্পের মোট ৩৫৬টি স্কুলের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ১৬০টি স্কুলের দৃষ্টি নন্দনকরণের নকশা উপস্থাপন করা হয়।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদেরকে বোঝা না ভেবে সম্পদে পরিণত করতে হবে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, প্রতিবন্ধীদেরকে বোঝা না ভেবে সম্পদে পরিণত করতে হবে। তারা যদি স্বাবলম্বী হতে পারে, তাহলে পরিবার ও সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। এজন্য তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের উপার্জনের সুব্যবস্থা করে দিতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এলক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। ১৪ই জানুয়ারি মেহেরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত হুইল চেয়ার ও হিয়ারিং এইড বিনামূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, অনেক সময় পরিবেশ দূষণের কারণে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হয়। সেজন্য পরিবেশ দূষণের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যত্রতত্র গড়ে ওঠা ইটভাটাগুলো পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। আমাদেরকে পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপন করতে হবে। এগুলো যাতে লোকালয় থেকে দূরে স্থাপন করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির অভাবেও প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নিতে পারে। তাই নারীরা যাতে পুষ্টিকর খাবার খায়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী করতে পাটজাত পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ

পরিবেশ সহায়ক আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি হাতেকলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে একেকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হয়ে উঠবে একেকজন উদ্যোক্তা এলক্ষ্যে সাভারে প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী করতে পাটজাত পণ্য তৈরি বিষয়ক তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়। ১৭ই জানুয়ারি পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রের (সিআরপি) হল রুমে এ প্রশিক্ষণটির উদ্‌বোধন করেন সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরি টেইলর। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি চলে ১৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রশিক্ষণের আয়োজকরা জানান, প্রাথমিক অবস্থায় ২০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যা চলতেই থাকবে। এ প্রশিক্ষণের কর্মসূচির আয়োজন করে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিস ডেভলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (সিডাব)।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

ম্যাচ সেরা সাকিব

১০ মাসের লম্বা সময় পর টাইগারদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার ম্যাচে রাজসিক ফেরা সাকিবের। ২০শে জানুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মিরপুর শেরেবাংলায় বল হাতে প্রত্যাশার চেয়েও ভালো করেছেন সাকিব। ৭.২ ওভারে মাত্র ৮ রান খরচ করে শিকার করেন ৪ উইকেট। বল হাতে নৈপুণ্য দেখানোর পাশাপাশি ব্যাট হাতেও সফল সাকিব। তার এমন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে বাংলাদেশ জিতে ৬ উইকেট। লম্বা বিরতির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে অলরাউন্ড নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতেন সাকিব।

শেখ জামালের নামে জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্স

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মেজ ছেলে লেফটেন্যান্ট শেখ জামালের নামে নামকরণ করা হয়েছে রমনা জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সের। ১৯শে জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে এটি। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন থেকে জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সের নাম 'শেখ জামাল জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্স'। ১৮ই জানুয়ারি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ডিসেম্বরে নারী অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ বাংলাদেশে

নারী অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আইসিসি ২০১৯ সালের অক্টোবরে। প্রথম আসরের আয়োজকের দায়িত্ব পেয়েছিল বাংলাদেশ। যেটি চলতি মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে টুর্নামেন্ট স্থগিত ছিল। আইসিসি'র সর্বশেষ সভায় টুর্নামেন্টের নতুন সূচি হয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে নারী অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের প্রথম আসর। ১৯শে জানুয়ারি এ তথ্য জানিয়েছেন বিসিবি'র উইমেন্স উইংয়ের চেয়ারম্যান শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল।

হাইজাম্পে ঋতুর জাতীয় রেকর্ড

৪৪তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখলেন ইসমাইল হোসেন ও শিরিন আক্তার। পুরুষ এককে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে দ্রুততম মানব হয়েছেন ইসমাইল, একই ইভেন্টের নারী এককে দ্রুততম মানবী হয়েছেন শিরিন। অন্যদিকে হাইজাম্পে জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঋতু আক্তার। নারীদের হাইজাম্পে ১.৭০ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে চমক দেখান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঋতু। এই ইভেন্টে সর্বশেষ জাতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উম্মে হাফসা রুমকি। ২০১৯ সালে ১.৬৮ মিটার উচ্চতায় জাম্প করেছিলেন তিনি। কিন্তু এবার তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন ঋতু।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন অভিনেতা আবদুল কাদের

আফরোজা রুমা

অভিনেতা আবদুল কাদের চলে গেলেন না ফেরার দেশে। জনপ্রিয় এই অভিনেতা ২০২০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

আবদুল কাদের ১৯৫১ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ি উপজেলার সোনারং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবদুল জলিল এবং মাতা আনোয়ারা খাতুন। তিনি সোনারং হাইস্কুল ও বন্দর হাইস্কুল থেকে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ অনার্স ও এমএ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ১৯৭২-১৯৭৪ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুহসীন হল ছাত্র সংসদের নাট্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ডাকসু নাট্যচক্রের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৩ সাল থেকে থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য এবং চার বছর যুগ্ম-সম্পাদকের ও ছয় বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি থিয়েটারের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকায় আমেরিকান কলেজ থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত অভিনয় কর্মশালায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। আবদুল কাদের বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাট্যশিল্পী ও নাট্যকারদের একমাত্র সংগঠন টেলিভিশন নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার সংসদের (টেনাশিনাস) সহসভাপতি ছিলেন।

আবদুল কাদেরের কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতা দিয়ে। তিনি অর্থনীতিতে সিঙ্গাইর কলেজ ও লৌহজং কলেজে শিক্ষকতা করেন। বিটপী বিজ্ঞাপনী সংস্থায় এক্সিকিউটিভ হিসেবে চাকরির পর ১৯৭৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক কোম্পানি 'বাটা'তে চাকরি করেন।

স্কুলজীবন থেকেই অভিনয় শুরু হয় তাঁর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকে অমল চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হয়। ১৯৭২ সালে আন্তঃহল নাট্য প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন মুহসীন হলের নাটক সেলিম আল দীন রচিত ও নাসির উদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন'-এ অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৭২ সাল থেকে টেলিভিশন ও ১৯৭৩ সাল থেকে রেডিও নাটকে অভিনয় শুরু হয় তাঁর।

হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'কোথাও কেউ নেই' ধারাবাহিক নাটকে 'বদি' চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক পরিচিতি পান আবদুল কাদের। দেশের অন্যতম মঞ্চনাটকের দল 'থিয়েটার'-এর সদস্য হয়ে দলটির ৩০টি প্রযোজনায় অভিনয় করেন তিনি। সেগুলোর মধ্যে 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'তোমরাই', 'স্পর্ধা', 'মেরাজ ফকিরের মা', 'দুই বোন' ও 'এখনো ক্রীতদাস' উল্লেখযোগ্য। ১৯৮২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবে বাংলাদেশের নাটক থিয়েটারের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এ অভিনয় করেন। এছাড়া দেশের বাইরে জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কলকাতা, দিল্লি, দুবাই এবং দেশের প্রায় সব কটি জেলায় আমন্ত্রিত হয়ে অভিনয় করেছেন।

২০০৪ সালে 'রং নাম্বার' নামের একটি সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন অভিনেতা আবদুল কাদের। তিনি বিটিভির জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'ইত্যাদি'-র নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি বেশ কিছু বিজ্ঞাপনের কাজও করেছেন এ সফল অভিনেতা।

দীর্ঘ অভিনয় জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে টেনাশিনাস পদক, মহানগরী সাংস্কৃতিক ফোরাম পদক, অগ্রগামী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী পদক, জাদুকর পিসি সরকার পদক, টেলিভিশন দর্শক ফোরাম অ্যাওয়ার্ড, মহানগরী অ্যাওয়ার্ডসহ বেশ কিছু পদকও পেয়েছেন আবদুল কাদের। গুণী এই অভিনয়শিল্পীর মৃত্যুতে সংস্কৃতি অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। ২৬শে ডিসেম্বর তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 08, February 2021, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd